দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

পুরোহিতের থেকে
মৌলবির লাশ
বেশি পুষ্টিকর
পৃঃ - ১১

ভাগাড়কাণ্ডে
কেঁচো খুঁড়তে
কেউটে বেরোল
পৃঃ - ১৩

৭০ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা।। ১৪ মে ২০১৮।। ৩০ বৈশাখ - ১৪২৫।। যুগাব্দ ৫১২০।। website : www.eswastika.com

- দশ বছর ধরে অবাধে চলছে ভাগাড়ের মাংসের কারবার
- ভাগাড়-কাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে
- শুধু একটা কোল্ড স্টোরেজ থেকেই বাজেয়াপ্ত হয়েছে ২০ টন পচা মাংস
- পশ্চিমবঙ্গের আইনানুযায়ী এদের সর্বোচ্চ শাস্তি ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

মানুষের পেটে ভাগাড়ের মাংস

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা, ৩০ বৈশাখ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ

১৪ মে - ২০১৮, যুগাব্দ - ৫১২০,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

জেরুজালেম তুমি কার? ▯ সুভাষ মোহান্ত ▯ ৬

খোলা চিঠি : আমি 'যাদবপুর' অসুখে আক্রান্ত, বাঁচান... ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ৭

জনতার প্রতি দায়বদ্ধ সংস্থা তৈরিতে পাকিস্তান ব্যর্থ ▯ খালেদ আহমেদ ▯ ৮

পুরোহিতের থেকে মৌলবির লাশ বেশি পুষ্টিকর ▯ অভিমন্যু রায় ▯ ১১

কলকাতার 'দেশি ম্যাজিস্ট্রেটের' বিড়ম্বনা ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম ▯ ড: প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ১৩

সুদের আমি সুদের তুমি, সুদ দিয়ে যায় না চেনা ▯ সুব্রত দত্ত ▯ ১৭

জনবিস্ফোরণের মতো সমস্যা এখনও অবহেলিত ▯ অশোক কুমার মণ্ডল ▯ ২০

ভাগাড়কাণ্ডে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোবে ▯ দেবক বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২৩

ভাগাড়ের বিষ তাড়াতে শক্তিশালী বিষ প্রয়োগ ▯ সুবিমল মুখোপাধ্যায় ▯ ২৫

ভ্রমণ : রাঙামাটির দেশে কয়েকদিন ▯ বেলা দে ▯ ২৬

সতীর পুণ্যে স্বামীর জীবন ▯ নন্দলাল ভট্টাচার্য ▯ ৩১

অখণ্ড ভারতের রূপকার আদি শঙ্করাচার্য ▯ ডা: সমীর কুমার চট্টোপাধ্যায় ▯ ৩২

গল্প : সিলভার জুবিলি ▯ সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ৩৪

ভারত ভাগের বলি উদ্বাস্তু, ভারতবাসীর নয়া সংকট ▯ চন্দন রায় ▯ ৪৩

কৃষি আন্দোলনে চাষিদের দুর্দশা মোচনের চেয়ে রাজনীতি বেশি হচ্ছে ▯ তারক সাহা ▯ ৪৪

বৈশাখ মাসে সবজি চাষ ▯ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▯ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ **চিঠিপত্র : ১৯** ▯ **অঙ্গনা : ২১** ▯ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ▯ **এইসময়, সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ▯ **নবাঙ্কুর : ৩৮-৩৯** ▯ **চিত্রকথা : ৪০** ▯ **রঙ্গম : ৪১** ▯ **অন্যরকম : ৪২** ▯ **বইপাড়ার খবর : ৪৯** ▯ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
২১শে মে, '১৮

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

খলনায়ক

প্রকাশিত হবে
২১শে মে, '১৮

ছেচল্লিশের দাঙ্গায় স্তূপাকার লাশের আশপাশে অপেক্ষমাণ শকুনের মধ্যে হিন্দু বাঙালি যাদের উপস্থিতি টের পেয়েছিল তাদের একজন যদি হন সুরাবর্দি, তাহলে অন্যজন অবশ্যই মহম্মদ আলি জিন্না। পাকিস্তানে তিনি কয়েদ-এ-আজম, কিন্তু ভারতে তার পরিচয় একটাই — খলনায়ক। তিনি দ্বিজাতি তত্ত্বের স্রষ্টা। পাকিস্তান সৃষ্টির জনক। আলিগড় মুসলিম ইউনির্ভাসিটির ছাত্ররা একথা মানতে নারাজ। এহেন এক খলনায়কের ছবি তারা ইউনিভার্সিটি থেকে সরাতে দেবে না। এটাই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার আকর্ষণ। এছাড়াও থাকছে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু এবং দামোদর সাভারকরের জন্মদিন উপলক্ষে দুটি বিশেষ রচনা। লিখবেন— রন্তিদেব সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার বিশ্বাস প্রমুখ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : SWASTIKA

A/C. No. : 0314050014429

IFSC Code : UTBI0BIS158

Bank Name :

United Bank of India

Branch : Bidhan Sarani

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

আলিগড়কে জিন্নামুক্ত করিতে হইবে

আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্র-সংসদের কক্ষে ভারত বিভাজনের খলনায়ক জিন্নার ফোটো কেন থাকিবে—এই বিষয় লইয়া কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যেভাবে বাজার গরম করিতেছেন তাহা কেবল লজ্জাজনকই নহে, অতীব দুর্ভাগ্যজনকও বটে। আরও আশ্চর্যের বিষয় হইল, তাঁহাদের কেন বোধগম্য হইতেছে না যে, দেশবাসী দেশমাতৃকার অঙ্গচ্ছেদনের সবচেয়ে কুটিল ব্যক্তির প্রতি প্রেম নহে, ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেছে। বাস্তব সত্য হইল, কোনও সভ্য সমাজ এইরকম কোনও ব্যক্তিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে না যে মাতৃহন্তারকের ওকালতি করে। জিন্না কেবল দেশমাতৃকাকে বিভাজনই করেন নাই, তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যার জন্যও দায়ী। ১৯৪৬ সালের কলকাতা ও নোয়াখালির হিন্দুহত্যা এবং ভারত বিভাজন-পরবর্তী হিন্দু হত্যা আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নরসংহার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এইসব ঘটনার নায়ক যে জিন্না তাহা বিশ্ববাসী অবগত আছেন।

তাহা সত্ত্বেও আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি কেন জিন্নার ফোটো রাখিয়া তাহার পূজা করিতে চায়? তাহারা কি জিন্নার মানবতাবিরোধী চরিত্র সম্পর্কে পরিচিত নহে? নাকি ইহার পশ্চাতে পুনরায় ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা চলিতেছে? জিন্নার সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন বামপন্থীরা। তাহাদের 'পাকিস্তান মানতেই হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে' স্লোগানটি জিন্নাকে তখন শক্তি জোগাইয়াছিল। আজ তাহারা সময়ের আস্তাকুঁড়ে স্থান পাইয়াছে। জিন্নাভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইতে তাহারা স্বভাবসিদ্ধ ভাবেই আলিগড়, আলিয়া জামিয়ার ছাত্রদের পাশে দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে ভয়ের কিছু নাই। কিন্তু ভয়ের ব্যাপার হইল, তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী ও কয়েকটি বাজারি সংবাদমাধ্যমকে লইয়া। তাহাদের কেহ সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর বন্দে মাতরম্ লেখা সত্ত্বেও জিন্নাভজনার টনিক পাঠকবর্গকে গিলাইতেছে, আবার কেহ সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপর মনীষীর বাণী পরিবেশন করিয়া জিন্না প্রীতিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। অতএব সময় আসিয়াছে ইহাদের হইতে সাবধান থাকিবার।

প্রতিবেশী বাংলাদেশ হইতে জিন্না ভক্তদের শিক্ষা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর ভারত যাহা করিতে পারে নাই বাংলাদেশ সেই কাজটিই করিয়া দেখাইয়াছে। দেশবাসীর ইচ্ছাকে সম্মান জানাইয়া তাহারা দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তা জিন্না ও তাঁহার সাকরেদদের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়াছে। ঢাকার জিন্না অ্যাভেনিউকে বঙ্গবন্ধু অ্যাভেনিউ, চট্টগ্রামের জিন্না সড়ককে বন্ধবন্ধু সড়ক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন্না হলকে মাস্টারদা সূর্য সেন হল, আইয়ুব গেটকে আসাদ গেট ইত্যাদি করিয়াছে। তাহারা রাজনৈতিক ভাবে সিদ্ধান্ত লইয়া দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তার নাম ও নিশান মুছিয়া দিয়াছে। তাহাদের আক্ষেপ, স্বাধীন ভারতে এখনও কেন জিন্নার ছবি শোভা পাইতেছে?

দেশপ্রেমিক দেশবাসীকে একটি সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে। তাহা হইল আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটিকে জিন্নামুক্ত করিতেই হইবে। মনে রাখিতে হইবে, এই জিন্না এবং আলিগড় ইউনিভার্সিটি দেশকে তিন টুকরা করিয়াছে। আলিগড় ইউনিভার্সিটি একটি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাই কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ আশা করিতেছে দেশবাসী।

সুভাষিতম্

সংপ্রাপ্য ভারতে জন্ম সৎকর্মসু পরাঙ্মুখঃ।
পীযূষকলসং হিত্বা বিষভাণ্ডং স ইচ্ছতি।।
ভারতবর্ষে জন্মলাভ করেও যে নিজের কল্যাণ চায় না, সে অমৃতকলস ত্যাগ করে বিষভাণ্ড আকাঙ্ক্ষা করে।

জেরুজালেম তুমি কার

সুভাষ মোহান্ত

মধ্যপ্রাচ্যের একটি ছোট দেশ ইজরায়েল। রাজধানী জেরুজালেম। আয়তন ৮০১৯-৮৫২২ বর্গ-মাইল।

পৃথিবীর যে কটা প্রাচীন ভাষা তথা শব্দভাণ্ডার রয়েছে তার মধ্যে 'হিব্রু' অন্যতম। হিব্রু ধর্মগ্রন্থের বিধিবিধান যারা মেনে চলেন তারা Jew বা ইহুদি নামে পৃথিবীতে পরিচিত। ইহুদি ধর্ম মধ্যপ্রাচ্যের প্রাচীনতম ধর্ম, যার বয়স আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর। খ্রিস্টধর্মের বয়স দু'হাজার সতেরো বছর। আর ইসলামের বয়স তেরশো পঁচাশি বছর। জেরুজালেমের 'টেম্পল মাউন্ট' ইহুদিদের এক এবং অদ্বিতীয় ধর্মক্ষেত্র। ইহুদিদের ধর্ম বিশ্বাস টেম্পল মাউন্টকে জড়িয়ে আছে। আজও ইহুদিরা টেম্পল মাউন্টকে পবিত্র জ্ঞান করে। ইহুদি প্রতিবাদী খ্রিস্ট ধর্মের জন্মের পরে ইহুদি থেকে খ্রিস্টরা টেম্পল মাউন্টে অধিকার কায়েম করতে চেয়েছে। যে কারণে জেরুজালেম (বেথলেহেম থাকা সত্ত্বেও) খ্রিস্টদের ধর্মপীঠ। মুসলিম ধর্ম অনেক বেশি আগ্রাসী মানসিকতা নিয়ে খ্রিস্ট ও ইহুদিদের বিতাড়ন করে জেরুজালেমে তাদের অধিকার দৃঢ় করে। টেম্পল মাউন্টে তারা খাঁড়া করে 'হারাম আল শরিফ'। মক্কা মদিনার পরে হারাম আল শরিফকে গুরুত্ব দিতে থাকে। এক জেরুজালেম নিয়ে তিন ধর্মের সংঘাত চলছে। জেরুজালেম থেকে খ্রিস্টরা প্রায় বিতাড়িত। ইহুদিরা চালাচ্ছে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম।

১৯৩৩ সালে জার্মানির চান্সেলর হন হিটলার। ২৪ মার্চ বিশেষ আইনের সাহায্যে জার্মানির সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন। ১৪ জুলাই নাৎসি ছাড়া সমস্ত পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। হিটলার ধুয়ো তুললেন— ''জার্মানির অবক্ষয়ের জন্য ইহুদিরা দায়ী। শুধু জার্মানি নয় ইউরোপের কোথাও তাদের বেঁচে থাকবার অধিকার নেই''।

১৯৩৮-এর ৯-১১ নভেম্বর তিনদিনে জার্মানি আর অস্ট্রিয়ায় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হলো অসংখ্য ইহুদি উপাসনালয়, দোকানপাট, বাড়িঘর। ১৯৪১ সালে (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ) গোটা ইউরোপকে ইহুদি মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নাৎসি নেতারা। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ১০ লক্ষের বেশি ইহুদিকে গুলি করে হত্যা করে নাৎসি বাহিনী। বন্দিশিবিরে পৌঁছানোর পরে মহিলা-বৃদ্ধ- শিশুদের হত্যা করা হয় বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ করে। প্রায় ৬০ লক্ষ ইহুদিকে বিভিন্ন বন্দি শিবিরে হত্যা করা হয়। আত্মগোপনকারী, বনে- জঙ্গলে, পাহাড়ে লুকিয়ে থাকা মাত্র ১৬০০০ ইহুদি বেঁচে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে (১৪ আগস্ট ১৯৪৫) তাদের উদ্ধার করা হয়। পৃথিবীর ইতিহাস এমন বীভৎস নারকীয় হত্যালীলা আর দেখেছে কি?

ইহুদিদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আদি পিতা-মাতা আদম ও ইভের উপাখ্যান। তাদের আদি পুরুষ আব্রাহাম। আব্রাহাম পরবর্তী মোজেস প্রথম ইজিপ্টে দাসত্ব করা একদল যাযাবরকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর টেন কম্যান্ডেন্টস্ হয়ে ওঠে হিব্রু বিশ্বাসের বনিয়াদ। তারাই প্রথম রুক্ষ্ম জনহীন 'কনান প্রদেশে' (বর্তমান প্যালেস্টাইন) বসতি গাড়েন। ক্রিট থেকে ফিলিস্তিনিরা ইহুদিদের অবাধে হত্যা করে সাজানো কনান প্রায় দখল করে ফেলে। শুরু হলো ইহুদিদের বাঁচার লড়াই। সউলের নেতৃত্বে ইহুদিরা রুখে দাঁড়ায়। এর পরে রাজা ডেভিড প্রথম জেরুজালেমে রাজধানী নির্মাণ করেন। রূপ দেন তীর্থক্ষেত্রের। ডেভিড পুত্র ইতিহাস বিখ্যাত জ্ঞানী সলোমন ইহুদি সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সুরক্ষা দান করেন। ৭৩২ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে আসিরীয়রা ইজরায়েল আক্রমণ করে বহু হত্যালীলা চালায়। এই সময়ে বহু ইহুদি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে বাধ্য হয়। ক্রুসেডের সময় ইহুদিদের উপর অত্যাচার বাড়ে। ১২১৫ খ্রি: তৃতীয় পোপ ইনোসেন্ট ও নবম পোপ গ্রেগরি (১২৩৯) ইহুদিদের যীশু ও খ্রিস্টধর্ম বিরোধী বলে আক্রমণ করেন। সমস্ত ইহুদি গ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলবার নির্দেশ দেন। ভস্মীভূত হয় কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহুদিরা তাদের নিজভূমি ইজরায়েলে নতুন করে রাষ্ট্র স্থাপন করে। রাজধানী করে জেরুজালেমে। ১৯৬৭ সালে পুনরায় ইহুদি নিধন যজ্ঞের সলতে পাকানো হয়। এবার অবশ্য খ্রিস্টান নয় আরব ভূখণ্ডের ছয়টি দেশ মিলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া ইহুদিরা মরণ কামড় দেয়। এক সঙ্গে ছ'টি দেশকে যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। সেই থেকে প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে ইহুদিদের ছোট্ট ভূখণ্ড (৮৫০০ বর্গমাইল) ঘিরে থাকা দেশগুলির মধ্যে। লাগাতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামও চলছে। ২০০০ সালে মন ভোলানো চুক্তি হয়। বিল ক্লিন্টনের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত চুক্তিতে সই করেন ইয়াসের আরাফত ও আইজ্যাক রবেন। আরাফতকে নোবেল প্রদান করা হয়। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। আবার চলছে গভীর ষড়যন্ত্রের বীজ বোনার কাজ। সম্প্রতি ট্রাম্প প্রশাসন (০৬-১২-২০১৭) জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজধানী ঘোষণা করে। এতে এই ঘটনায় পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে (ইসলামিক রাষ্ট্র জোট) ইস্তামবুলে গোপন ষড়যন্ত্র চললো (১৫-১২-২০১৭), রব উঠলো ইসলাম বিপন্ন। ফের শুরু হয়েছে ইহুদিদের ঘিরে অশান্তির কুরুক্ষেত্র রচনার কাজ। ইহুদিদের এ যন্ত্রণার শেষ কোথায় আমাদের জানা নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যে কটা কারণ ছিল ইহুদি নিধন যজ্ঞ ছিল অন্যতম। তাই আশঙ্কা হয়, এই ইহুদি বিদ্বেষ আবার তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ না হয়ে দাঁড়ায়। ■

আমি 'যাদবপুর' অসুখে আক্রান্ত, বাঁচান...

মাননীয় পাঠক-পাঠিকা,

অনেক দিন পরে আপনাদের চিঠি লিখছি। আসলে আমি একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত। না, আমি নয়, আমরা। যারা কলকাতা ঘিরে থাকি।

আমরা বাওয়াল করতে খুব ভালোবাসি। তার থেকেও বেশি ভালোবাসি সেই বাওয়াল দেখতে। সাইডলাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে কার না ভালো লাগে। কারও হাত-পা নিশপিশ করলে ময়দানে নেমে পড়তে সময় লাগে না বেশিক্ষণ।

কিন্তু ঠিক কী কারণে ঝামেলা হচ্ছে, তা ভাবার সময় আমাদের হাতে নেই। মোবাইল যুগে আমরা সবাই মোবাইল। কোন ঘটনার কতটা সত্যি, কোন অভিযোগের কতটা মিথ্যে, তা জানার সময় ও আগ্রহ কোনওটাই আমাদের নেই।

তাই অর্ধসত্য জেনেই 'দাদা হাত থাকতে মুখে কেন' বলে ঝাঁপিয়ে পড়লেই হলো। আগে পিছে দেখার কোনও দরকার নেই। 'আলিঙ্গন' নিয়ে ঠিক এটাই হচ্ছে চারিদিকে— সেই স্টেশন থেকে সোশ্যাল মিডিয়া সর্বত্র।

আমরা কী ভাবছি, ঠিক কতটা প্ররোচনা থাকলে এই হাতাহাতি ঘটে একজনের সঙ্গে আর একজনের? এই ঝামেলার মাঝে অন্যরা তো নিজেদের অন্য রাগ এখানে ঝেড়ে চলে গেল। মেট্রো রেলের মতো পাবলিক প্লেসে কতটা প্রাইভেট কাজ করা যায়, কতটা করা হয়েছিল সে হিসেব কি কেউ করলেন? তাঁরা 'বুড়ো ভাম'-দের ঠিক কী কী ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন তা কেউ কি জানে!

তার উপরে সেই অর্ধসত্য জেনেই কয়েকজনের 'অপরাধী' ছবি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। একবারও ভাবলাম না, কী অবস্থা সেই সব মানুষের ও তাঁদের পরিবারের যাঁরা কোনও ভাবেই গণধোলাইয়ের সঙ্গে যুক্ত নন, কিন্তু ছবি দেখেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে উঠল গণধোলাইয়ের মানসিকতা।

একবার যখন ভেবে নিয়েছি, এটাই সত্যি তখন বিরুদ্ধ মত নিয়ে ভাবার কোনও দরকারই নেই আমাদের। অন্য মত এলেই আবার শুরু হলো সোশ্যাল মিডিয়ার গণধোলাই। এই অসুখটার নামই যাদবপুর। না, বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি না। এই অসুখে আক্রান্তরা কথায় কথায় কলরব করেন। স্যানিটারি ন্যাপকিন থেকে কনডোম নিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। সত্য, মিথ্যা না জেনে আক্রমণ করে যেতে হবে। সব সময়েই আক্রান্ত হিন্দুত্ব এবং ভারতের সনাতন সংস্কৃতি। শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে কালি লাগানো থেকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোরুর মাংস খাওয়া, প্রকাশ্যে চুমু খাওয়া, বিপরীত লিঙ্গকে জড়িয়ে ধরা— এটাই যাদবপুর অসুখের লক্ষণ।

এই অসুখে আক্রান্ত রাজ্যের সংবাদমাধ্যমও। এই চুমুচাটির প্রচার না করে আলিপুরদুয়ারের তাপসী দাসের ঘটনায় যে নজর দেওয়ার দরকার ছিল, তাই আমরা ভুলে গেলাম অনেকে।

তাপসী দাসকে তাঁর ধর্ষকের সঙ্গে বিয়ে করতে বাধ্য করা হলো। অভিযোগ উঠল, তাঁকে অন্তত বার ছ'য়েক নিজের গর্ভপাত করাতে হয়েছে। শেষ বার যৌনাঙ্গের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে টেনে বের করে আনা হয়েছে মৃত ভ্রূণ। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা গেছেন তাপসী। কিন্তু পুলিশ চুপ থাকল। ১১ দিন ধরে রক্তক্ষরণ হতে হতে ২৪ বছরের তাপসী মরেই গেল। ওর স্বামী যে তৃণমূল করে।

যাদবপুর অসুখ আমাদের চোখে ঠুলি বেঁধে দিয়েছে। আমরা দেখতেই পাই না সমাজের এই সব ভয়। আমরা স্লোগান তুলি— আমার প্রেমিকাকে আমি যেখানে সেখানে জড়িয়ে ধরব। যত খুশি চুমু খাব। প্রকাশ্যে আদর করব। বেলেল্লাপনা করব। কার বাবার কী?

—সুন্দর মৌলিক

জনতার প্রতি দায়বদ্ধ সংস্থা তৈরিতে পাকিস্তান ব্যর্থ

অতিথি কলম

খালেদ আহমেদ

সম্প্রতি লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানি সাহিত্য উৎসবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব পাকিস্তানের গভর্নর ইশরাত হুসেন তাঁর নতুন প্রকাশিত বইটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেছিলেন। তাঁর বইটির নাম ভারি ইঙ্গিতবহ। Governing the Ungovernable ' Institutional Reforms for Democratic Governance.' বাংলা করলে বোঝায়— 'যাকে নিয়ন্ত্রণ করাই যায় না তাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস— গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য নির্ধারিত সংস্থাগুলির প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার।' বইটিতে কোনও ঢাক ঢাক গুড় গুড় যেমন করা হয়নি তেমনি অত্যধিক নিরাশাবাদকেও বাহবা দেওয়া হয়নি।

লেখক মেনে নিয়েছেন পাকিস্তানে বিভিন্ন কালপর্বে যে সমস্ত সেনাধ্যক্ষ শাসন পরিচালনা করেছেন তাঁদের কেউ কেউ মাঝে মধ্যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভালো কাজ করেছেন। আবার জেনারেল আয়ুব খান যেসব ভালো কাজ করেছিলেন জিয়া-উল-হক তাঁর পাকিস্তানের অন্ধ ইসলামিকরণের মাধ্যমে সেই সব সদর্থক প্রতিক্রিয়াকে নষ্ট করে দেন। জিয়াই প্রথম দেশের অভ্যন্তরে কালাশনিকভের মতো মারণাস্ত্র নিয়ে ঘোরা ও মাদক সেবনের কুসংস্কৃতির বিস্তার ঘটান। এরই ফলে গোটা দেশব্যাপী জাতিগত শুধু নয়, ছোট ছোট সম্প্রদায়গত হিংসাও হু হু করে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরই পরিণতিতে ব্যাঙের ছাতার মতো দেশ জুড়ে বেআইনি ও সমান্তরাল অর্থনীতি মাথাচাড়া দেয়। যে অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল অস্ত্র ও নানা ধরনের মালের চোরাচালান। একই সঙ্গে জিহাদি দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমমনোভাবাপন্নদের প্রশ্রয়দানও এই শাসকদের কাজের আওতার মধ্যে ছিল।

বাস্তবে জেনারেল জিয়া ভুট্টোকে হটিয়ে যে শাসন ক্ষমতা দখল করেন তার পটভূমি ভুট্টো নিজেই তৈরি করেছিলেন। তার কারণ তিনি যখন দেশের মধ্যে জাতীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন তখন আদৌ খেয়ালই করেননি দেশে ইতিমধ্যেই যৌথ মালিকানাজনিত বহু সমস্যা ও বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা দখল ইস্তক ভুট্টো হত্যার ভূত তাঁকে মানসিকভাবে নাস্তানাবুদ করতে থাকে। সঙ্গে যোগ হয় আফগানিস্তানের জিহাদে তাঁর জড়িত থাকার অভিযোগ। তাঁর সরকারে একজন অতি রক্ষণশীল অর্থমন্ত্রীও ছিলেন যাঁর নাম গুলাম ইমাক খান। জিয়াউল হকের মৃত্যুর পর থেকেই পাকিস্তানে নিত্যদিন সরকার উলটে দিয়ে রাতারাতি ক্ষমতা দখলের রীতি চালু হয়ে যায়। এই বিষয়টার সঙ্গে সারা বিশ্ব এখন খুবই পরিচিত হয়ে গেছে।

বইটিতে হুসেন জানিয়েছেন বিশেষ করে ৯০-এর দশকের কথা যখন অর্থনীতির বিকাশের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশ বৃদ্ধির শীর্ষ ছোঁবার চেষ্টায় রত ছিল, ঠিক তখনই পাকিস্তানের ব্যর্থতা শুরু, যা এখনও কাটিয়ে ওঠা যায়নি।

এই সূত্রে হুসেন পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গী হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগ্রগতিও লক্ষ্য করেন। ২০০১ থেকে ২০১৩-র মধ্যে পাকিস্তানের নাগরিকদের মাথাপিছু খরচ চার ডলার থেকে ১০ ডলারে পৌঁছয়। তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা নিশ্চিতভাবে বাড়ে তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়। পাকিস্তানি জনসংখ্যার ৪২ শতাংশ এখন এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই পরিণতিতে পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীলতার প্রভাব দেখা যায়। ২০০১ থেকে ২০১৫-র মধ্যে দারিদ্র্যসীমার নজরকাড়া সংকোচন হয়, তার প্রতিফলন হিসেবে কিন্তু কর আদায়ে তেমন কোনও বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়নি। উল্টে তা ছিল চরম হতাশাব্যঞ্জক। ২০০৭ -০৮ অর্থবর্ষে দেশে বিধিসম্মত অর্থনীতির পরিমাণ ছিল শতকরা ৯ শতাংশ যেখানে বেআইনি অর্থনীতির বহর ছিল ৯১ শতাংশ। এই বইতেই তাঁর অকপট বিবরণে দেখা যায় দেশে ব্যাপক হারে মাদ্রাসা গড়ে উঠতে থাকে। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্তরা চরম গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিতে থাকে। একই সঙ্গে তারা হিংসার আশ্রয় নিতেও দেরি করেনি। এই সময় দেখা যায় সরকার তার নিজের পরিচালিত বা অন্য বেসরকারি উদ্যোগে চলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির থেকে এই ধর্মীয় শিক্ষার ঘাঁটি মাদ্রাসাগুলিরই বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করছে। রাজনীতিবিদদের দেশের চাকুরিপ্রার্থীদের জন্য বিন্দুমাত্র মাথা ব্যথা ছিল না। তারা ইংরেজি মাধ্যমে চলা প্রতিষ্ঠানগুলি তুলে দেওয়ার ফরমান জারি করেছিল। অন্যদিকে ধর্মীয় শিক্ষাস্থল মাদ্রাসার আদর্শে শিক্ষিতদের নিয়োগকারীরা পত্রপাঠ বিদায় করে দিত। লেখক হুসেন নির্দ্বিধায় লিখেছেন, 'বিগত তিন দশক ধরে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ বা মতানৈক্য বিশেষ করে তা যদি ধর্মীয় কোনও বিষয় নিয়ে হয় সেক্ষেত্রে চরম অসহিষ্ণু ও হিংস্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। আর এই ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সংশ্লিষ্ট হিংসাই দেশে শ্রেণী, জাতি বা অন্য যে কোনও ভেদাভেদকে হটিয়ে প্রধান গুরুত্বের জায়গা করে নিয়েছে। এটিই হয়েছে জাতীয় আলোচনার বিষয়বস্তু। এই

পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি যতই অসন্তোষ ব্যক্ত করুক না কেন, তারা এই আধা গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতিতেই মদত দিয়ে যায়, কেননা তাদের আমেরিকা নিয়ে যে মানসিক বিকার রয়েছে তার বাইরে বেরোতে পারে না। তারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে মার্কিনরাই ''regularly form and remove governments in Islamabad.''

দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতাশার মানসিকতাই ঠিক করে দেয় দেশের অর্থনীতি চলমান আছে কিনা? একটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে— যদি ধরা যায় পাকিস্তানে বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হয়েছে, দেশের গরিবের সংখ্যা খানিকটা কমতে দেখা গেছে সেক্ষেত্রে এই শুভ সংকেতগুলিকে অর্থনীতির পরিসংখ্যানের গোলকধাঁধা এবং মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হবে। অন্যদিকে, সেই সরকারি পরিসংখ্যান সংস্থাই যখন দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে ১০-১২ শতাংশে পৌঁছনোর খবর দেবে সেটা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হবে। এই পরিসংখ্যানকে ঢাল করেই ক্ষমতায় থাকা শাসককে আক্রমণ করা হবে। পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে বলে Objective Resolution নামে এক প্রতিজ্ঞা পত্র তৈরি করেছিলেন। আরবে বসবাসকারীরা একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্র চালু করতে গিয়ে 'Arab Spring' নামে এক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় নিজেদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করছে। লেখক হুসেন বিষয়টি বোঝাতে প্রখ্যাত লেখক গুনার মিরডালের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন— ''পাকিস্তানের মানুষের সামাজিক চিন্তাস্তরে এখুনি পরিবর্তন প্রয়োজন। তারা সর্বদা যা কিছু ব্যক্তিগত নয়, তাকে ব্যক্তিগত করে তোলে। অন্যকে নিরন্তর দোষারোপ করা, সর্বদা চক্রান্তের তত্ত্ব খাড়া করা, দু'রকম কথা বলা, ভণ্ডামি, পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যেও ফটিল সৃষ্টি করার প্রবণতা নিয়ে চলে। এর সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে গাজোয়ারির মনোভাব অর্থাৎ সব কিছুই গায়ের জোরে অর্জন করা যায়। ঠিকঠাক যোগাযোগ রেখে টাকা ছড়ানোর অভ্যাস তাদের কিছুতেই কাজের ক্ষেত্রে নৈতিক পথে যেতে দেয় না।

হুসেনের মতে, পাকিস্তানে একমাত্র পঞ্জাবই হচ্ছে সঠিক ভাবে শাসিত প্রদেশ। এই মর্মে নাগরিকদের মধ্যে থেকে যে মতামত পাওয়া গেছে পঞ্জাবের ক্ষেত্রে তা সর্বাধিক ৩৮ শতাংশ। বালুচিস্তান ও সিন্ধুর ক্ষেত্রে তা মাত্রই ২৬ ও ২৫ শতাংশ। যতই দোষারোপ বা নিন্দনীয় বলা হোক না কেন, আম পাকিস্তানির কাছে এখনও সেনাবাহিনীই সেরা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। শতকরা ৭৬ জন তাদের ওপর আস্থাশীল, এর পরেই রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট, ৬২ শতাংশ। নিম্ন আদালতগুলির কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো। বইটি একটি বড় সংশয় দূর করেছে। সেটা হলো— সারা বিশ্বে এটা গৃহীত মানদণ্ড যে দেশের জিডিপির ৩ শতাংশ অবধি সেনাবাহিনীর দেখভালের জন্য বরাদ্দ হলে তা বাঞ্ছিত সীমার মধ্যেই থাকবে, ছাড়িয়ে গেলে বিপদ। অর্থাৎ তা সাধারণ নাগরিকের অংশে ভাগ বসানো।

হুসেন জানাচ্ছেন, ৫ লক্ষ ২০ হাজার সেনাবাহিনীর পেছনে ১৯৯০-২০১৫ সালের সময়সীমায় ওই ৩ শতাংশই বরাবর খরচ হয়ে এসেছে।

হুসেন শেষ করেছেন এইভাবে— পাকিস্তানের আজন্ম ও অসংশোধনীয় সমস্যাই হচ্ছে নাগরিককে সুশাসন ও পরিষেবা দেবে এরকম দায়বদ্ধ সংস্থা তৈরি ও প্রাণবন্ত রাখার ব্যর্থতা।

“পাকিস্তানের মানুষের সামাজিক চিন্তাস্তরে এখুনি পরিবর্তন প্রয়োজন। তারা সর্বদা যা কিছু ব্যক্তিগত নয়, তাকে ব্যক্তিগত করে তোলে। অন্যকে নিরন্তর দোষারোপ করা, সর্বদা চক্রান্তের তত্ত্ব খাড়া করা, দু'রকম কথা বলা, ভণ্ডামি, পারস্পরিক বিশ্বাসের মধ্যেও ফটিল সৃষ্টি করার প্রবণতা নিয়ে চলে।”

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বাঁকা চোখে

প্যারাস্যুট

একবার একই বিমানে ধোনি, আম্বানি, রাহুল গান্ধী, নরেন্দ্র মোদী ও একটি ছোট্ট মেয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ বিমানে কিছু গড়বড় হওয়ার কথা ঘোষণা করা হলো। ওখানে ৪টি প্যারাস্যুট ছিল। ধোনি বললেন— আমি বিশ্বের বড় ক্রিকেটার। আমার বেঁচে থাকাটা খুবই জরুরি। বলেই একটি প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। আম্বানি বললেন— আমি ভারতের ধনী লোকেদের মধ্যে অন্যতম। আমার বেঁচে থাকা জরুরি। বলেই একটি প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাহুল গান্ধী বললেন— আমি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। আমারও বেঁচে থাকা খুব প্রয়োজন। বলেই একটা কিছু নিয়ে লাফিয়ে পড়লেন। নরেন্দ্র মোদী ছোট্ট মেয়েটিকে বললেন— তুমি দেশের ভবিষ্যৎ। তুমি অবশিষ্ট প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ো। মেয়েটি বলল, না-না। আরও দু'টি প্যারাস্যুট রয়েছে। রাহুল গান্ধী আমার স্কুল ব্যাগ নিয়ে লাফিয়ে পড়েছে।

ভাগাড়

হিন্দু খেল গোরু আর
মুসলমানে শুয়োর
মরা মুর্গি সবাই খেল
বড়লোক বা পুওর।

এসব দেখে একটি তত্ত্ব
দিচ্ছে মনে চাগাড়,
সাম্যবাদ আর সেকুলারের
মূল ঠিকানা ভাগাড়।

উবাচ

"কংগ্রেস দলের কোনও দিল (হৃদয়) নেই, দলিতদের প্রতি ব্যথাও নেই। কংগ্রেস শুধু সমঝোতার (ডিল) পার্টি।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনী সফরে

"যদি আপনি একজন মুসলমান হন এবং দেওয়ালে জিন্নার ছবি লাগাতে চান, তাহলে আপনি আপনার পূর্বপুরুষকেই উপহাস করছেন।"

জেনারেল (অব) ভি কে সিংহ
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিন্নার ছবি সরিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গে

"দিদির সরকার ডান্ডা দিয়ে রাজ্য দখল রাখতে চাইছে। পুলিশ ও গুণ্ডা দিয়ে গণতন্ত্র হত্যা চলছে রাজ্যে।"

কৈলাস বিজয়বর্গীয়
বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা

ঘাটালে নির্বাচনী প্রচারে

"যাঁরা নমাজ পড়েন তাঁরা জানেন কোথায় প্রার্থনা করা যায়। তাই এ নিয়ে বিবাদ না করাই ভালো। নমাজ মসজিদে বা বাড়িতেই পড়া উচিত।"

মুখতার আব্বাস নকভি
কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী

নমাজ বিতর্কে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য

"জিন্নার কারণে আমাদের আজকের এই বিভাজন ও সাম্প্রদায়িকতার সূচনা হয়েছে।"

বাপ্পাদিত্য বসু
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সদস্য

আলিগড় ইউনিভার্সিটিতে জিন্নার ছবি রাখা প্রসঙ্গে

পুরোহিতের থেকে মৌলবির লাশ বেশি পুষ্টিকর

অভিমন্যু রায়

আসিফা আসিফা আসিফা। এক আসিফায় দেশ তোলপাড়। শ্রীনগর থেকে রামেশ্বর, পাশিঘাট থেকে পোরবন্দর, মানুষের 'বিবেক' জেগে উঠেছে। বিশিষ্টজনেরা টুইট করছেন। মাঝারি বিশিষ্টরা প্রেস ডাকছেন। অল্প বিশিষ্টরা বিবৃতি লিখে চেনা জানা সাংবাদিক ধরছেন,—দে ভাই ছাপিয়ে দে, অন্তরের জ্বালা প্রকাশ পেতে দে। যাদের তাও করার নেই তারা বেছে নিয়েছেন ফেসবুক। তাদের দীর্ঘশ্বাস নিঃসৃত কার্বন ডাইঅক্সাইড ধূসর করে তুলেছে ফেসবুকের মুখ। শুরু হয়েছে এন্তার রোষ নিঃসরণ। সবাই এখন আসিফা। সবাই এই নৃশংস ঘটনার সব খুঁটিনাটি জানে। বিচারসভা বসে গেছে। শুধু শাস্তির রকমফের নিয়ে নানা মুনির নানামত। কেউ বলছে পুরুষাঙ্গ কেটে দাও। কেউ বলছে ফাঁসিতে ঝোলাও। কেউ বলছে ল্যাম্পপোস্টে লটকাও। শরিয়তি পথে ঢিল ছুড়ে হত্যার নিদেনও দিচ্ছেন কেউ কেউ। আবার কেউ কেউ বলছে ওই পথে যেও না, কারণ চারজন পুরুষের সাক্ষী না হলে আসিফার উপর ধর্ষণ যে হয়েছে শরিয়তি মতে তা প্রমাণ করতে কালঘাম ছুটবে।

যথারীতি শুরু হয়ে গেছে রাজনীতির মহারঙ্গ যাত্রাপালা। আজকাল রাস্তায় পা মচকালেও মোদীর বিবৃতি দাবি করার চল হয়েছে। কোনও মুসলমান বাড়ির কুকুর মরলেও আঙুল উঠছে হিন্দু সংগঠনের দিকে। সারা পৃথিবীতে ব্রাত্য হয়ে পড়া মতবাদের কফিন বাহকদের আজ বাস্তবিকই সর্বহারা দশা। রাজ্যপাট যেতে যেতে তিনখানা থেকে আধখানায় ঠেকেছে। কিন্তু সংখ্যালঘু তোষণের পুরনো অভ্যেস এখনো পুরোমাত্রায় বহাল। মাঠে ঘাটে বিপ্লবের দিন এখন শেষ। তাই বিপ্লব চলছে অগতির গতি সোশ্যাল মিডিয়ায়। আর মাঝে মাঝে গড়িয়া থেকে যাদবপুরের রাজপথে, তাও আবার রাস্তার একধার ধরে। আসিফাদের ঘটনা যেন এই মৃত্যুপথযাত্রী মতবাদের ক্ষয়িষ্ণু ধারক ও বাহকদের এক সঞ্জীবনী টনিক।

আসিফা নামক বাচ্চা মেয়েটার সঙ্গে যা হয়েছে তার নির্মমতা কোনও বিশেষণেই মাপা যায় না। মানবতার লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকলে যে কেউ এর বিচার চাইবেন। দোষীদের ভয়ঙ্কর সাজা চাইবেন। এই ব্যাপারে কোনও দ্বিমত নেই। থাকতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন জাগে শুধু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কিছু মানুষের 'বিবেক' অতি সক্রিয় হয়ে ওঠে কেন? ধর্ষণ কি আর কোথাও হচ্ছে না? নাবালিকা ধর্ষণ কি একেবারেই বিরল! কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের গলায় 'রা-ফোটে না কেন? কেন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই কবির ইচ্ছে হয় লাথি মেরে মন্দির আর বিগ্রহ ভেঙে ফেলার? কেন শুধু ত্রিশূলেই কন্ডোম পরানোর রিরংসা জাগে? কেন শুধু হিন্দুত্ববাদকেই পায়ে মাড়ানোর সাধ হয়?

আসিফা যাযাবর বকরওয়াল গোষ্ঠীর মেয়ে। ধর্মে মুসলমান। অভিযুক্ত সকলেই হিন্দু। অকুস্থল একটি মন্দির। পুরোহিত নাকি এই ঘৃণ্য কর্মের সহযোগী। এর চেয়ে বড়ো

ভারতের রাজনীতিতে পুরোহিত লাশের তুলনায় মৌলবির লাশ বেশি ফলদায়ী। তাই সে লাশ বেশি পুষ্টিকর। রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে ব্লক ভোট ফলাবার সম্ভাবনা বাড়ায়। একই তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় ধর্ষণের ক্ষেত্রেও। ধর্ষিতা সংখ্যালঘু হলে তা রাজনৈতিক ভাবে পুষ্টিকর ইস্যু বলে গণ্য হয়।

রসায়ন আর কী হতে পারে? অতএব চিল চিৎকার শুরু। আসিফার পরিবারকে ন্যায় পাইয়ে দেওয়াই কি লক্ষ্য? তবেই হয়েছে। আসিফা উপলক্ষ্য মাত্র। লক্ষ্য তো মোদীকে বেঁধা। লক্ষ্য হিন্দুত্ববাদীদের বদনাম করা। লক্ষ্য ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচন। লক্ষ্য বিজেপি-আর এস এস-এর মুণ্ডু চিবানো।

শুধু মানবতা ইস্যু হলে আসিফাকে নিয়ে এত মাতামাতির পাশে পূজা সরকারের নামও মনে পড়তো 'বিবেকবানদের'। হতভাগী পূজা সরকার। বীরভূম জেলার বোলপুরের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের দরিদ্র কলেজ ছাত্রী। তার স্নান আর কাপড় পরিবর্তনের দৃশ্য লুকিয়ে ভিডিও করে নিয়ে, তা নেটে আপলোড করার ভয় দেখিয়ে বার বার ধর্ষণ করা হয় পূজাকে। দুঃখ, ক্ষোভ, লজ্জা ও আত্মগ্লানিতে গায়ে কেরোসিন ঢেলে অগুন লাগিয়ে দেয় মেয়েটি। কদিন যমে মানুষে টানাটানির পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে মারা যায় সে। পূজার মৃত্যুর ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসে। কিন্তু 'বিবেকবান' সমাজের তখন কোনও সাড়াশব্দ নেই। এই যে নেই তার একটা মোক্ষম কারণ আছে। সে কারণ হলো ধর্ষকের পরিচয়। তার নাম-গোত্র-ধর্ম। হাফিজুল শেখ ধর্ষক হলে তার বিরুদ্ধে আর কতটাই বলা যায়! আসিফার ধর্ষকদের ক্ষেত্রে সিংহগর্জন হলে ধর্ষক হাফিজুলের ক্ষেত্রে নেড়ি কুকুরের কেঁউ কেঁউও শোনা যায় না। কলকাতা থেকে বোলপুর কতদূর। পঁচিশে বৈশাখে, ফাল্গুনে বসন্ত-উৎসবের অছিলায় কত আঁতেল-বাতেলই তো গিয়ে জমা হয় বোলপুরে। পূজার শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে তাদের কাউকে দেখা যায়নি। গড়িয়া থেকে ঢাকুরিয়া কোনও মোমবাতি মিছিল হয়নি। কোনও শঙ্খনাদ উঠেনি, গান বাঁধেনি কোনও কবির, লালন। পূজা জন্মেছিল যে ধর্ষিত হয়ে গায়ে আগুন দেবার জন্যই। তার জন্য কারও সময় নেই। কারও কোনও দায় নেই।

আসল কথা হলো ধর্ষণ, হত্যা, অত্যাচার কোনও ইস্যুই নয়। যদি তা হতো তাহলে

প্রতিটি ধর্ষণের প্রতিবাদেই রাজপথ অচল হতো। মোমবাতি মিছিলে গলে পড়তো পুঞ্জীভূত ক্ষোভ। সব শিশু-ধর্ষণই ভাইরাল হতো। তা কিন্তু হয় না। যেমন হয়নি মাসখানেক আগে অসমের নওগাঁ জেলার পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা। দুর্ভাগা মেয়েটিকে পাঁচ সাবালক ও নাবালক মিলে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে কেরোসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়েছিল। এক্ষেত্রেও মেয়েটি নিরীহ দরিদ্র হিন্দু পরিবারের আর ধর্ষকরা হলো জাকির, আমাদুল, হোসেন ইত্যাদি নামধারী। এই ঘটনা পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এসেছে। কিন্তু কোনও তাপ উত্তাপ নেই। 'বিবেকবান' জনতার সময় নেই ফিরে তাকাবার। এক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবীদের চোখে রং চশমা। লেখকদের কলম কালিহীন। জনমানবের হৃদয় ভাতঘুমে।

আসলে সাধারণ মানুষের অতো ভাবার সময় নেই। ভাত কাপড়ের সন্ধানে উদ্‌ভ্রান্ত জীবন। তার ফাঁকে ফাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ার তরঙ্গে বুঝে না বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়া। সবাই আসিফা আসিফা চিল্লাচ্ছে তবে আমিও পিছে থাকি কেন। আমার ওয়ালে লিখে দেই, আমিও আসিফা। কেন লিখছিস ভাই? আরে বিদ্রোহী কবি লিখেছে যে। আর ওই যে কতবড় ফিল্মস্টার, উনিও লিখেছেন। দাদারা লিখছে। খুবই খারাপ ঘটনা। দেশ রসাতলে যাচ্ছে। চিলিচিকেন আর শাহিকাবাব খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে— বুঝলি পদা, দেশ রসাতলে যাচ্ছে।

কমল হাসান। ফিল্মের পাট চুকে গেছে। এখন লাক ট্রাই করছেন রাজনীতিতে। আসিফার ঘটনায় উনিও খুব বিচলিত। উনিও এই ব্যাপারে রাজনৈতিক বিবৃতি জারি করেছেন। সরকারকে জ্ঞান দিয়েছেন। তামিলনাড়ু কোথায়, আর কোথায় কাশ্মীর। কমলের ঘরের কাছেই কর্ণাটক। উত্তর কানাড়া জেলাও খুব বেশি দূর নয়। কমল হাসান কি ওই জেলার গারদল্লী গ্রামের দরিদ্র মেয়ে শান্তির নাম শুনেছেন? হয়তো শুনেছেন, হয়তো শোনেননি। মেয়েটি তার ঘরে খিল দিয়েও নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। দরজা ঠেলে ঢোকা বারো বন্ধুর গণধর্ষণের শিকার হতে হয়েছিল তাকে। খুব বেশি পুরানো ঘটনা নয়। অসহায় মেয়েটি প্রথম দিনের চোট সামলে উঠতে না উঠতে দ্বিতীয় দিনও একই আক্রমণের শিকার হয়। এই হতভাগীর হতভাগ্য নিয়েও সোশ্যাল মিডিয়া তৎপর হয়নি। কারণও সেই এক। এক্ষেত্রেও ধর্ষকদের নাম ফয়েজ, হারুণ, সাদিক, আলিফ, জামিল, ইলিয়াস নিয়াজ, নাসরুল্লা ও তাদের স্বগোত্রীয় বন্ধুরা।

কমল হাসান যদি জেনেও থাকেন তার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি তাকে বেশি হৈ চৈ করার অনুমতি দেয়নি। কারণ সেই সংখ্যালঘু তোষণ। ওদের ব্লক ভোট। যে ভোটের মোহে ভারতের বেশিরভাগ রাজনৈতিক দল নিজেদের ঘোষিত নীতি ও আদর্শ ইতিমধ্যেই বিসর্জন দিয়েছে।

ফেসবুকের বামাচারীদের দেওয়ালে এখন প্রায়ই দেখা যায় একটা লেখা—''এ বড়ো বিপন্ন সময়'। এই লাইনটিই একটু ঘুরিয়ে বলা যায়— 'এ বড়ো আজব সময়'। মানুষ মারা যাচ্ছে, শিশু ধর্ষিতা হচ্ছে। আর একদল লোক যারা নিজেদের বিশ্ববিবেকের ঠিকাদার ঘোষণা করে বসে আছেন, তাঁরা বসে বসে আহত নিহত ধর্ষিতের ধর্ম খুঁজছেন। অপরাধীর গোত্র দেখছেন। তারপর ঠিক করছেন তাঁরা তাঁদের বিবেকের ব্যবহার করবেন কিনা। কোথায় যেন পড়েছিলাম লাশেরও নাকি পুষ্টিগুণ থাকে। সব লাশ সমান হয় না।

ভারতের রাজনীতিতে পুরোহিত লাশের তুলনায় মৌলবির লাশ বেশি ফলদায়ী। তাই সে লাশ বেশি পুষ্টিকর। রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রয়োগে ব্লক ভোট ফলাবার সম্ভাবনা বাড়ায়। একই তত্ত্ব প্রয়োগ করা যায় ধর্ষণের ক্ষেত্রেও। ধর্ষিতা সংখ্যালঘু হলে তা রাজনৈতিক ভাবে পুষ্টিকর ইস্যু বলে গণ্য হয়। ফলে এই ইস্যুতে কার আগে প্রাণ কে করিবে দান পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়। অথচ ধর্ষণের যন্ত্রণা আসিফা, পূজা, শান্তি বা নওগাঁর মেয়েটি কারও ক্ষেত্রেই পৃথক কিছু নয়। মৃত্যুযন্ত্রণার ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কিন্তু তথাকথিত বিবেকবানদের সৌজন্যে পুষ্টিগুণ বিবেচনায় প্রতিবাদের মাত্রা পৃথক হয়। যারা আসিফার ঘটনায় পা মাথা এক করে নাচছেন তাদের বেশিরভাগই মুষ্টিমেয় দুর্বুদ্ধিজীবীর অভিসন্ধির শিকার হয়েছেন। নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অজান্তেই কোনও রাজনৈতিক পরিকল্পনায় ভাড়া খাটিয়েছেন।

নিজের বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করে একবার ভাবুন দেখি, প্রতিবাদ তো সব ধর্ষণের ক্ষেত্রে হওয়া উচিত। ধর্ষিতা এবং ধর্ষকের পরিচয় বুঝে বুঝে যে প্রতিবাদ, তা প্রতিবাদের নামে এক ধরনের শয়তানি তামাশা বই কিছু নয়।

কলকাতার 'দেশি ম্যাজিস্ট্রেটের' বিড়ম্বনা ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম

ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের কলকাতায় দু'ধরনের রূপান্তর ঘটেছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় আধুনিক নগর পরিকল্পনার নানান কর্মকাণ্ড শুরু হয়। আর অন্যদিকে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উন্মেষ ঘটে। এদেরই হাত ধরে বাংলায় বৌদ্ধিক সংগ্রাম শুরু হয়। আলেকজান্ডার ডাফ এই শিক্ষিত উদীয়মান সমাজকে নবযুগের দিশারি বলে অভিনন্দন জানান। ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েও তাঁরা দেশ ও জাতির মঙ্গলে সতত সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিমণ্ডলে থেকে কি দেশবাসীর কল্যাণ করা সম্ভব? এই বিষয়টিই আলোচ্য প্রবন্ধে তুলে ধরতে চাইছি। চেতনার সংগ্রাম ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রামে যারা আত্মনিবেদন করেছিলেন তাদেরই অন্যতম শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র (১৮২২-১৮৭৩)। কিশোরীচাঁদের অনবদ্য ভূমিকার কথা উল্লেখ করে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছিলেন,

"সাহসী কিশোরী চাঁদ' ফীল্ড সম্পাদক
লিখিতে বলিতে পটু, স্বদেশ পালক"

হাঁ, দীনবন্ধু মিত্রের পক্ষেই কিশোরীচাঁদের উৎকর্ষ ও মহত্ত্ব তুলে ধরা সম্ভব হয়েছিল। দুজনে ছিলেন একই সময়ের প্রতিনিধি। দুজনেই ছিলেন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের অন্তর্ভুক্ত। দুজনেই পদস্থ সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন। আর দুজনের মনেই পরাধীনতার গ্লানি ছাপ ফেলেছিল। আলোচনার মূল আখ্যানে যাওয়ার আগে কিশোরীচাঁদের পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা প্রয়োজন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র উত্তর কলকাতার এক অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তিনি ও তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্যারীচাঁদ মিত্র উনিশ শতকের নবজাগরণ ও আত্মানুসন্ধানের বলিষ্ঠ প্রতিনিধি ছিলেন। প্যারীচাঁদ ও কিশোরীচাঁদ দুজনেই কলকাতার হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। হিন্দু কলেজের পরিমণ্ডলে দুজনেই যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্যারীচাঁদ তাঁর শিক্ষাগুরু লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আর কিশোরীচাঁদ ছিলেন প্রথমে ডেভিড হেয়ার ও পরে ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন-এর ছাত্র। ছাত্রজীবন সম্পন্ন করে সংবাদপত্রে লেখালেখি শুরু করলেন। বেঙ্গল হরকরা, বেঙ্গল স্পেক্টেটার প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর মনোজ্ঞ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ সালে কলকাতা রিভিউ পত্রিকায় রাজা রামমোহনের অবদান সম্পর্কে কিশোরীচাঁদের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ বাংলা সরকারের সচিব হ্যালিডের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি অচিরে কিশোরীচাঁদকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত করেন।

প্রশাসক জীবনে কিশোরীচাঁদ লোকহিতকে তাঁর কর্মপদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে মনে করতেন। প্রথমে রাজশাহি জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন। সেখানে দীঘপাতিয়ার জমিদার রাজা প্রসন্ননাথ রায় ও অন্যান্য জমিদারদের সহায়তায় কিশোরীচাঁদ রাজশাহি জেলায় বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। এছাড়া রাস্তাঘাট

কিশোরীচাঁদ মিত্র

দীনবন্ধু মিত্র

নির্মাণ করে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেন। নাটোরে থাকাকালীন জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কয়েকটি জলাশয় খনন করেন। কিশোরীচাঁদের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রশাসনের শুধুমাত্র আইন ও বিচারের কাজ নয়, তা প্রজামঙ্গলের পক্ষেও প্রয়োজনীয় একথা কিশোরীচাঁদ প্রমাণ করেছিলেন।

১৮৫২ সালে কিশোরীচাঁদ জাহানাবাদ বর্তমানে আরামবাগে বদলি হলেন। জাহানাবাদ মহকুমা সে সময় ডাকাতি,

সমাজবিরোধী কাজের লীলাক্ষেত্র ছিল। কিশোরীচাঁদ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটান এবং শিক্ষার প্রসারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

কিশোরীচাঁদের কর্মদক্ষতায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষত লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁর উদ্যোগে ১৮৫৪ সালে কিশোরীচাঁদ কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে নিযুক্ত হন। তাঁর বেতন মাসিক ৩৫০ টাকা থেকে এক ধাক্কায় ৮০০ টাকা দাঁড়াল।

কিশোরীচাঁদ উত্তর কলকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের পদে আসীন হয়ে দেশহিতকর কাজকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তিনি দু'ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। প্রথমত, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ায় প্রভাবশালী ইংরেজদের সমাজ কল্যাণ কাজকর্মে সহযোগিতা পান। দ্বিতীয়ত, কলকাতার বিশিষ্ট দেশীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বদেশবাসীর নৈতিক ও সামাজিক মানোন্নয়নে সচেষ্ট হলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় শিল্প বিষয়ক সমিতি গঠিত হলো। এই সমিতির উদ্যোগে কলকাতা স্কুল অব ইনডাস্ট্রিয়াল আর্টস নামে শিল্প বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এরপর জ্যেষ্ঠভ্রাতা প্যারীচাঁদ ও তাঁর সুহৃদ রাধানাথ শিকদারের সহায়তায় পাইকপাড়ায় একটি বিদ্যালয় গড়ে তোলেন।

কিন্তু শুধুমাত্র শিক্ষার প্রসার নয়, সামাজিক কুসংস্কার ও গলদের বিরুদ্ধে কিশোরীচাঁদের উদ্যোগে বঙ্গীয় সামাজিক উন্নতি বিধায়নী সভা স্থাপিত হয় (১৮৫৪-এর ডিসেম্বরে)। সুহৃদ সমিতি নামে পরিচিত এই সভার সভাপতি ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর সম্পাদক হলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র। কিশোরীচাঁদ স্পষ্ট ভাষায় বলেন আমাদের কুসংস্কার সকল প্রকার সামাজিক সংস্কারের প্রধান বাধা। তাঁর ভাষায় ''যখন ভারতবর্ষ তাহার সঙ্কুচিত ধর্মের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তখনই আমরা জাতীয় পার্থক্য ও অন্যান্য সামাজিক পাপের নিকট হইতে মুক্ত হইব।'' তাই ঠিক হলো হিন্দু সমাজের বর্তমান সামাজিক বাধা নিষেধ দূর করার জন্য সুহৃদ সমিতি সচেষ্ট হবে। কিশোরীচাঁদ ও অক্ষয় কুমার দত্ত প্রস্তাব দিলেন যে স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বাল্যবিবাহ বর্জন ও বহু বিবাহ প্রচলনের জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা হবে। হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন জানানো হবে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন কিশোরীচাঁদই প্রথম হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন পেশ করেছিলেন। এরপর বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিয়ে প্রবল জনমত গঠন করেন। কিশোরীচাঁদ তাঁর প্রচেষ্টায় ছিলেন মরমি সহযোগী।

সাম্রাজ্যবাদ শাসনের প্রত্যাঘাত :

কিশোরীচাঁদ ছিলেন একাধারে সমাজ সংস্কারক, আবার অন্যদিকে জাতীয় আত্মপরিচয়ের প্রবক্তা। ১৮৫৭ সালের ৬ এপ্রিল কলকাতার টাউন হলে এক জনসভায় ফৌজদারি মামলায় জাতি, ধর্ম ও সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে কোনও প্রকার বৈষম্য করা যাবে না এই মর্মে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই সভায় কিশোরীচাঁদ ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ ও এ দেশীয় প্রজাদের মধ্যে কোনও প্রকার বৈষম্য না করার মত ব্যক্ত করেন। কিশোরীচাঁদের মনোভাব ইংরেজ কর্তা ব্যক্তিদের মনঃপূত হয়নি।

স্বাভাবিকভাবেই কিশোরীচাঁদের বিরুদ্ধে ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরা সরব হলেন। এই সময় কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন মি. ওয়াকোপ। তিনি সরকারের

কাছে কিশোরীচাঁদের বিরুদ্ধে নালিশ জানালেন। এই সময় কিশোরীচাঁদ ছিলেন কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট। পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। পুলিশ কমিশনারের মতামত না নিয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারতেন। এদিকে কিশোরীচাঁদ সুখ্যাতির সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম 'জাস্টিস অব দি পিস' ক্ষমতা পান। তিনি অপক্ষপাতমূলক কাজের জন্য সুখ্যাতি পান। দেশীয় আসামি হলে কঠিন শাস্তি পাবে আর ইংরেজ আসামি নিষ্কৃতি পাবে— এই মতামত সমর্থন করতেন না। কিন্তু ইংরেজ কর্তারা প্রকৃত ন্যায়বিচারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার ওয়াকোপ একের পর এক রিপোর্ট পাঠাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত সরকার কিশোরীচাঁদের কাছে রিপোর্ট তলব করলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ম্যাজিস্ট্রেটের উপর মন্তব্য করার অধিকার পুলিশ কমিশনারের ছিল না। তাই কিশোরীচাঁদ বিচার বিভাগের স্বাধীনতারক্ষায় সচেষ্ট হলেন। কিশোরীচাঁদ যুক্তি সহকারে পুলিশ কমিশনারের অভিযোগ খণ্ডন করলেন। ওয়াকোপের আইন সম্পর্কে অজ্ঞতার উল্লেখ করলেন। ৭ জুলাই ১৮৫৮ সালে কিশোরীচাঁদ আত্মপক্ষ সমর্থন করে জানালেন যে পুলিশ কমিশনার স্মৃতিশক্তির উপর ভিত্তি করে একজন ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেছেন। তাঁর মতে একজন পুলিশ অফিসার কীভাবে সিভিলিয়ান অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানোর সাহস পায়। বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে কিশোরীচাঁদের দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি বিষয়টি আপসে মিটিয়ে ফেলার পরামর্শ দেন। কিন্তু কিশোরীচাঁদ আপস রায়ে রাজি হলেন না। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন কিশোরীচাঁদের পরম সুহৃদ। তাঁদের পরামর্শে কিশোরীচাঁদ প্রকাশ্য বিচারের দাবি জানালেন।

বিচারে কিশোরীচাঁদের প্রতি সরকার পক্ষপাতমূলক মনোভাব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৮ সালের ২৮ অক্টোবর কিশোরীচাঁদ কর্মচ্যুত হলেন। কিশোরীচাঁদ বিচারের প্রহসন সম্পর্কে তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন "He (Police Commissioner) has accused me and I have accused him and one of us must go to the wall. But he being a member of the pet service is almost certain to triumph over me." প্রমাণিত হলো ব্রিটিশ প্রশাসনে দেশীয় কর্মচারীরা শ্বেতাঙ্গদের সমমর্যাদার দাবি করতে পারেন না। মনীষী কৃষ্ণদাস পাল মন্তব্য করেছিলেন মাটির পাত্র ও কাঁসার পাত্রে ঠোকাঠুকি বাধলে যা ঘটে, তাই হয়েছে।

কিশোরীচাঁদের কর্মচ্যুতি প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজে সরকারি বৈষম্য নীতির সমালোচনা করলেন। 'দেশি ম্যাজিস্ট্রেট' শিরোনামে খান কয়েক প্রবন্ধে বিদেশি কর্মচারীদের পক্ষে ও দেশি কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য আচরণের নিন্দা করা হয়।

চাকুরি জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কিশোরীচাঁদ দেশ ও জাতির মঙ্গলে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তাঁর সম্পাদনায় ইন্ডিয়ান ফিল্ড পত্রিকা অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। নীল বিদ্রোহের সময় দুর্গত নীলচাষিদের স্বপক্ষে তিনি সুস্পষ্টভাবে মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

কিশোরীচাঁদ ছিলেন মননশীল লেখক। সরকারি প্রশাসনের কাজকর্ম থেকে বিতাড়িত হওয়ায় কিশোরীচাঁদের বিভিন্ন তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'বাংলার জমিদারবর্গ' প্রবন্ধ হতে তাঁর অসামান্য রচনাশৈলীর পরিচয় মেলে।

কিশোরীচাঁদ শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। ঠিক একই পরিণতি হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দেশি আই সি এস অফিসার সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সুরেন্দ্রনাথ চাকুরি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিশোরীচাঁদের মতো তিনিও সাংবাদিকতার পেশায় যুক্ত হন। বেঙ্গলি পত্রিকায় তিনি সরকারি প্রশাসনের জনবিরোধী চরিত্র তুলে ধরেন। তারপর ১৮৭৬ সালে তিনি ভারতসভা গঠন করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মঞ্চ স্থাপন করেন। ততদিনে কিশোরীচাঁদ প্রয়াত হয়েছেন। হয়তো কিশোরীচাঁদ জীবিত থাকলে সুরেন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়াতেন।

(লেখক স্টেট আর্কাইভের পূর্বতন ডিরেক্টর)

With Best Compliments from -

A

Well Wisher

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ

1977

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০২৯

Regd. NGO NITI AAYOG, Govt. of India, New Delhi • Govt. Regd. W.B.

ফোন ঃ 9830597884, 9073402682, (033) 2463-7213

প্রতিষ্ঠাতা ঃ স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবাজী মহারাজ

৩৯তম বর্ষের কোর্স

ডিপ্লোমা কোর্স ইন্ অ্যাডভান্স থেরাপিউটিক হঠ এণ্ড রাজযোগ

পাঠ্যসূচী ঃ ইনট্রোডাকশন টু ইণ্ডিয়ান ফিলোসফি, অষ্টাঙ্গযোগ,অ্যানাটমি ও ফিজিওলজি, ফুড এণ্ড নিউট্রিশন, সাম কমন ডিজিজেস্, ইণ্ডিয়ান ডায়াটেটিক্স, ভেষজের (হার্বাল) প্রয়োগ, ন্যাচারওপ্যাথি,রাজযোগ ও কুণ্ডলিনীযোগ, হরস্কোপ থেরাপি, মেডিটেশন প্রাক্টিস, [স্ট্রেস(Stress) ম্যানেজমেন্ট], যোগ প্রাক্টিক্যাল (আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা), থেরাপিউটিক ম্যাসাঝ্ (যৌগিক ও ফিজিওথেরাপি), স্ট্রেচিং, যৌগিক জিম (পাওয়ার যোগা), যৌগিক চিকিৎসা (ট্রিটমেন্ট), প্রাক্টিস টিচিং।

সময়কাল ঃ ১ বৎসর, প্রতি রবিবার ১ টা থেকে ৪ টে পর্যন্ত

যোগ্যতা ঃ ১৮ বছর বয়স ও সর্বনিম্ন মাধ্যমিক পাশ

আরম্ভ ঃ ২৪শে জুন ২০১৮

কোর্স ফি ঃ ৮০০০ টাকা, এককালীন ৬০০০ টাকা, ফর্ম ও প্রস্পেক্টাস ১০০ টাকা, ডাকযোগ ১২০ টাকা

ভর্তি চলছে

সুদের আমি সুদের তুমি, সুদ দিয়ে যায় না চেনা

সুব্রত দত্ত

সুখেন বাবু আজ খুব সকাল সকাল মর্নিংওয়াকের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, যতক্ষণ না সতীর্থদের খুশির খবরটা দেওয়া যাচ্ছে মনটা অস্থির হয়ে আছে। গতকালই ব্যাঙ্ক থেকে জেনে এসেছেন যে, তার গৃহঋণের ৬ লক্ষ টাকা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রকল্পে ৬.৫ শতাংশ ছাড়ে লোন পাচ্ছেন। বহুদিনের শখ বাড়ির টালি সরিয়ে ছাদ দেবেন ও অন্যান্য টুকটাক কাজ করবেন। মেয়ে জামাই বাড়িতে এলে নিজের খুব সংকোচ হয়! একটা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর গ্রহণের পরে ১৫ লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদি আমানতে রেখে বার্ষিক ৮.৬ শতাংশ সুদে মাসে ১০৭৫০ টাকা ও একটা বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল থেকে স্ত্রীর সামান্য রোজগারে সংসারে সেরকম অভাব নেই বললেই চলে। কিন্তু বহুদিনের দুঃখ একটা পাকা বাড়ি হলো না আজ পর্যন্ত, যদিও অনেকবার চেষ্টা করেছেন হোম লোন নেবার, কিন্তু বার্ষিক ৯-১০ শতাংশ সুদে ইএমআই-এর হিসেবে শুনেই পিছিয়ে এসেছেন। গত রবিবার সুকান্ত সদনে কোনও এক সংগঠনের ডাকা ব্যাঙ্কের সুদের হার কমা নিয়ে আলোচনা সভায় গিয়ে সুখেনবাবুর খুব রাগ হয়েছিল সরকারের নীতির উপর। আর হবেই না বা কেন, আজ তিনি অনুভব করছেন ২ ঘণ্টার ওই সভায় বিভিন্ন বক্তারা কীভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আসল তথ্যই গোপন করে তাদের মতো মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখছিলেন।

এবার তাহলে অতি সংক্ষেপে দেখা

সারণী

সাল	মুদ্রাস্ফীতি হার	সুদের হার %							
		২৪১ দিন ১ বছর	প্রকৃত সুদের হার %	১-২ বছর	প্রকৃত সুদের হার %	২-৩ বছর	প্রকৃত সুদের হার %	৩-৫ বছর	প্রকৃত সুদের হার %
২০১২	১০	৬.৫	-৩.৫	৮.৫	-১.৫	৮.৫	-১.৫	৮.৫	-১.৫
২০১৩	৯.৮	৭.৫	-১.৯	৯	-০.৪	৯	-০.৪	৯	-০.৪
২০১৪	৫.৮	৭.৫	১.৭	৮.৭৫	২.৯৫	৮.৭৫	২.৯৫	৮.৭৫	২.৯৫
২০১৫	৪.৯	৭.২৫	২.৩৫	৭.৫	২.৬	৭.৭৫	২.৮৫	৭.৭৫	২.৮৫
২০১৬	৪.৫	৭	২.৫	৭.১৫	২.৬৫	৭.২৫	২.৮৫	৭.২৫	২.৮৫
২০১৭	৩.৮	৬.৭৫	২.৯৫	৬.৫	২.৭	৬.৫	২.৭	৬.২৫	২.৪৫

যাক ব্যাঙ্কের সুদের বিভিন্ন পরিসরগুলো ও তার প্রেক্ষাপট কী? এটা সত্যি যে ২০১২-র তুলনায় ২০১৭-২০১৮-এ ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত সুদের হার কমেছে। উদাহরণস্বরূপ, ৩ থেকে ৫ বছরে রাখা আমানতে সুদের হার ৮.৫ শতাংশ থেকে কমে ৬.২৫ শতাংশ হয়েছে। এরকম অন্যান্য আমানতেও সুদের হার অনুরূপ ভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত। ব্যাঙ্কের সুদের হার মূলত নির্ধারণ করা হয় ওই সময়ের মুদ্রাস্ফীতির উপরে, যেটা মেনে চলা হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরামর্শে। আমরা ব্যাঙ্ক থেকে যদি অপেক্ষাকৃত বেশি সুদ পাই আর দৈনন্দিন জিনিসপত্রের দামও যদি তার তুলনায় বেশি হতে থাকে তাহলে ওই বর্ধিত হারে সুদ পাওয়া নিরর্থক হয়। প্রকৃত সুদ হলো ওই সময়ে প্রাপ্ত সুদের হার ও একই সময় মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য। ধরা যাক কিছুদিনের ব্যবধানে সুদের হার ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেল, কিন্তু ওই সময়ের ব্যবধানে কেজি প্রতি আলুর দাম গড়ে ১০ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২ টাকা হলো অর্থাৎ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেল নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি পণ্যে।

এইভাবে বেশ কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবার মূল্য বৃদ্ধির ফলে যদি অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি হয়, তবে সুদের হার বৃদ্ধি কোনও কাজে লাগে না। তাই সুদের হার বৃদ্ধির চেয়েও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য-পরিষেবার মূল্যবৃদ্ধি তথা মুদ্রাস্ফীতিকে সর্বসাধারণের একটা নির্দিষ্ট সহ্যসীমার মধ্যে রাখতে পারলে সবার লাভ।

এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক ২০১২ থেকে পরবর্তী ৫ বছরে সুদের হার এবং মুদ্রাস্ফীতির হারের পরিবর্তনের ফলে প্রকৃত সুদের হারের পরিমাণে আমানতকারী ক্ষতিগ্রস্ত, নাকি লাভবান হলো। *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

সারণীতে দেওয়া সুদের হার প্রত্যেক বছরে সেপ্টেম্বর মাসের।

সূত্র : স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া।

অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে তুলনা করলে ২০১২ ও ২০১৩ সালে প্রদত্ত সুদের হার ব্যবহারিক অর্থে ছলনার নামান্তর।

উদাহরণ স্বরূপ, তিনটি দেশে— ইরান, আর্জেন্টিনা, ইউক্রেনের ব্যাঙ্কের গড় সুদের হার দেখলে আমাদের কাছে বেশ লোভনীয় মনে হবে, যথাক্রমে ১৫ শতাংশ, ১৭ শতাংশ, ২০ শতাংশ। কিন্তু যেই মুহূর্তে সেই দেশগুলির মুদ্রাস্ফীতির তালিকাটাও যথাক্রমে ১৫.৩ শতাংশ, ২৭.৬ শতাংশ, ৪৯ শতাংশ পাশাপাশি রাখা হয় হয়, তখন পুরো বিষয়টাই একটা হেয়াঁলি বলে মনে হয়! অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিশ্বে এদের অবস্থান আমাদের বহু পিছনে, যথাক্রমে ১৫৬, ১৪৪, ১৫০ (ভারতের স্থান ১৩০)।

এ তো গেল ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত সুদের আলোচনা। এর বিপরীতটা একটু দেখে নেওয়া যাক অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে আমরা কীভাবে সুদ প্রদান করি। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের একটা বিরাট অংশ গৃহঋণ নিয়ে থাকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ হিসেবে। ২০১৭-র পূর্ববর্তী ১০ বছরের একটা পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় এই গৃহঋণ পরিশোধের সুদের হার বার্ষিক গড়ে ৯-১০ শতাংশ ছিল। ২০১৭-র ৩১ মার্চে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুসারে গৃহ ঋণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ৩ শতাংশ (৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ), ৪ শতাংশ (১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ) ও ৬.৫ শতাংশ (৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণে) সুদ ছাড়ের ব্যবস্থা হয়েছে।

অর্থাৎ সুখেনবাবুর মতো বেশ কিছু ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ আমানতে (ডিপোজিট) ব্যাঙ্ক থেকে প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ ওই একই পরিমাণ ঋণে দেয় সুদের পরিমাণের থেকে বেশি। আরও বিস্তারিত ভাবে বললে— কোনও এক ব্যাঙ্কে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত ক বাবু ও খ বাবু প্রত্যেকে ৬ লক্ষ টাকা করে ১০ বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে রাখলেন, ব্যাঙ্ক তাদের ৮.৬ শতাংশ হারে প্রত্যেক মাসে ৪৩০০ টাকা করে মোট ৮৬০০ টাকা সুদ দেবে। আবার অন্য দুই ব্যক্তি গ বাবু ও ঘ বাবু আবেদন করে ওই ব্যাঙ্ক থেকে গৃহঋণ বাবদ প্রত্যেকে ৬.৫ শতাংশ ছাড়ে বা বার্ষিক (৯-৬.৫) ২.৫ শতাংশ হারে প্রদেয় ৬ লক্ষ টাকা করে পেলেন। ওই দুই ব্যক্তির থেকে ব্যাঙ্কের সুদ বাবদ প্রথম মাসে আয় ১২৫০ টাকা করে মোট ২৫০০ টাকা। সহজ পাটিগণিতের বিচারে ব্যাঙ্ক ও গ্রাহকের মধ্যে এই পরিমাণ লেনদেনে ব্যাঙ্কের ক্ষতিই হয়। আমাদের মতো বিরাট জনবহুল দেশে এই লেনদেনের পরিমাণটা যথেষ্ট বড় অঙ্কের।

যারা সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য দুঃখে কাতর হয়ে প্রতিবাদে নেমে পড়েন তারা এই সত্যটুকু বলেন না যে, বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী প্রবীণ নাগরিকদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি দুই প্রকার ঘোষিত আমানত প্রকল্পে ৮ শতাংশ ও ৮.৬ শতাংশ সুদের হারের উপর ভবিষ্যতে কোনও পরিবর্তন করা হবে না এই আশ্বাসনও আছে। তাদের একটুকু বাসার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য বর্তমান সরকারের ভালোবাসার হাত দেখতে পাচ্ছেন তখন সেটাকে ওই মেকি মানবদরদিরা সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছেন পাছে বিপ্লবী বুলির চাষের ক্ষেত্র নষ্ট না হয়ে যায়!

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

মহরম ও মহরমের মিছিল

দেবপ্রসাদ সরকার 'দুঃখের উৎসব মহরমে কেন শুভেচ্ছা' শীর্ষক পত্রে (স্বস্তিকা, ১৩.১১.১৭) লিখেছেন, কারবালা প্রান্তরে এক হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধে বহু মুসলমানের সঙ্গে হাসান হুসেন নামে দুই ধর্মপ্রাণ মুসলমানের মৃত্যু হয়। কথাটিতে একটু গলতি আছে। বলা বাহুল্য, পত্রোক্ত 'দুই ধর্মপ্রাণ মুসলমান' হলেন, চতুর্থ খলিফা হজরত আলির পুত্র, নবি হজরত মহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হুসেন। কারবালার যুদ্ধের সঙ্গে হাসানের কোনও যোগ নেই। ওই ঘটনার (৬৮০ খ্রি:) বছর এগারো আগে এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বিষ মেশানো জলপানের ফলে মদিনায় ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল।

প্রাক্-ইসলামি যুগে আরববাসীগণ তাদের বছরের প্রথম দু'মাসকেই 'সফর' বলে ডাকত। সফর 'আওয়াল', অর্থাৎ প্রথম সফর এবং সফর 'সানি', অর্থাৎ দ্বিতীয় সফর। সে যুগে আরব-বেদুইনরা সব সময় যুদ্ধ বিগ্রহ, খুনোখুনিতে ব্যস্ত থাকত। বছরে তিন মাস রণক্লান্ত অবস্থায় বিশ্রাম নিত। ওই তিন মাস ছিল জুলহজ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় সফর। অতঃপর, প্রথম ও দ্বিতীয় সফর মাস দুটিকে হারাম বা পবিত্র মাস বলা হতো, যেহেতু এই দুই মাসে কোনও অশান্তি বাঁধানো হতো না। কালক্রমে প্রথম মাসটিকেই কেবল 'হারাম' বলা হতে থাকে এবং দ্বিতীয় মাসটিকে দ্বিতীয় সফর না বলে কেবল 'সফর' বলা হতে থাকে। এই ভাবেই একদিন আরবি বছরের প্রথম মাসটিই 'হারাম' বলে পরিচিতি লাভ করে এবং এই 'হারাম' শব্দ হতেই 'মহরম' নামের আবির্ভাব। এসব অতীতের কথা। তখন আজকের ইসলাম জন্ম নেয়নি। সুতরাং অতি সহজেই অনুমেয় যে, প্রাচীনতম মাস মহরমের সঙ্গে আজকের নবীন কারবালার কোনও যোগসূত্র ছিল না, থাকাটা সম্ভবও নয়। অতি প্রাচীনকাল থেকে মহরম মাসের দশম তারিখটিকে 'আশুরা' বলা হয়। নানা কারণে দিনটি অতি পবিত্র। কথিত আছে, এই দিনটিতে বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। যথা— বাইবেলের আদম সৃষ্টির প্রথম মানব এই দিনে জন্মেছিলেন। মহাপ্লাবনের পর নোয়ার নৌকা এই দিনে ডাঙ্গায় নোঙ্গর করেছিল। ইহুদিরা 'আশুরা' দিনটিতে উলুধ্বনি দেয় এবং উপবাস করে। ওই ভাবে দিন-উদ্‌যাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে মদিনার ইহুদিরা নবি হজরত মহম্মদকে জানায় যে, দিনটি 'আশুরা', ওই দিনে অত্যাচারী ফারাও সদলবলে নীল নদের জলে ডুবে মারা যায় এবং ইহুদিরা দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে। সেই থেকে হজরত মহম্মদ 'আশুরা' পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তবে, ইহুদির থেকে ভিন্নতা রেখে তিনি একদিনের পরিবর্তে নয় আর দশ দুদিন রোজা রাখার নিয়ম প্রবর্তন করেন (ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন-রিয়াদ থেকে 'মায়ের ডাক', ১০.৪.০৩)।

ইরানে শিয়া অভ্যুত্থানের আগে কারবালা প্রান্তরের মর্মন্তুদ ঘটনার স্মরণে ইসলামে কোনও শোকানুষ্ঠান পর্বের অস্তিত্ব ছিল না। সুলতানি ও মোগল আমলে ভারতে নবাব, আমির ও উমরাহদের একটা বড় অংশই ছিল শিয়া। এদের প্রভাবেই সুন্নি প্রজাদের মধ্যেও ওই শোকানুষ্ঠান পালনের রেওয়াজ চালু হয়। অধ্যাপক হোসেনুর রহমান দু'দশক আগে 'ধর্ম উৎসব প্রগতি' শীর্ষক নিবন্ধে বলেছেন, মহরম বলতে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান কারবালা প্রান্তরে হাসান-হোসেনের মর্মান্তিক ট্রাজেডিকে বোঝে। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতার পথে যারা মহরম পালন করে তারা অতীত দিনের সমস্ত মহান ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিয়েছে। এক ভয়াবহ উৎসবে পরিণত হয়েছে মহরম। লাঠি-সোটা, বোমা-পটকা, এক অবর্ণনীয় উন্মত্ততা। অধ্যাপক গনি তাঁর একটি নিবন্ধের উপসংহারে বলেছেন— ''দশ মহরমে যে ভঙ্গিতে মহরমের মিছিল, তাজিয়া, দুল্-দুল্ সমূহ চলতে থাকে এবং তার সঙ্গে যে বল্গাহীন তাণ্ডবনৃত্য, কাওয়ালি-কীর্তন, দামামা ও ছুরি, তলোয়ার, বর্শা-লাঠি ইত্যাদির মহাস্রোত বইতে থাকে, তা দেখে কোনও পাগলও একে শোকমিছিল বলবে না।...বর্তমান মহরমের অকথ্য চিত্রটি আশু পরিবর্তনের দাবি রাখে।''

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকতা-৬০।

ভারতের সনাতন ধর্ম

ভারতের সনাতন ধর্মের বিষয়ে কিছু বলতে গেলে শুরুতেই যেই বাক্যবন্ধ দিয়ে নিবন্ধের আরম্ভ করতে হয়, তা হলো, ভারতের সাহিত্য, ভারতের ইতিহাস এবং সর্বোপরি ভারতের অন্তর্নিহিত দর্শনই হলো ভারতের সনাতনধর্ম। ভারতের সনাতন ধর্ম হলো ভারতের সংস্কৃতি। বর্তমান যুগে যাকে আমরা ভাষা, লোকসংস্কৃতি, লোকগাথা, লোকায়ত রীতি নীতি বলে অভিহিত করি। ধর্ম শব্দের, অভিধানিক মানে খুঁজলে যেটা পাই, সেটা কখনোই 'Religion' নয়। ধর্ম অর্থ 'Property' বা 'Characteristics'! ভারতের সনাতন ধর্ম তাই কোনওদিন, কখনও, কোনও ভাবে 'Religion'-এর কথা বলেনি! তার বিশালত্ব তার চারিত্রিক গুণে।

আমাদের স্বভাব সুলভ একটা 'Notion' আছে বা ভ্রম আছে, আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, খ্রিস্টান, শিখ, ইত্যাদি। এখানে বিশেষ ভাবে বলার প্রয়োজন, ভারতের সনাতন ধর্ম মতে মানুষ জন্ম নিলেই সে হিন্দু! ''By birth each individual is a HINDU''। কেননা হিন্দু হতে হয় না বা হিন্দুত্বের গ্রহণের কোনও ব্যাপার স্যাপার, সনাতন হিন্দু ধর্মে নেই! কিন্তু ইসলামকে গ্রহণ করতে হয়, কলমা পড়তে হয়, সুরাহা পড়তে হয়, জন্মেই সে ইসলামি হয় না। সেরকমই 'খ্রিস্টান'দের Baptised হতে হয়, খ্রিস্টান হতে হলে। শিখদেরও তাই এবং অন্য ধর্মের ক্ষেত্র তাই! আসলে তফাতটা এখানেই, অন্য ধর্ম বলা মানে, অন্য 'Religion' বোঝানো হচ্ছে। আসলে ভারতের সনাতন ধর্ম কোনও 'Religion' নয়, এখনও নয়, কোনও কালেই নয়।

—সন্দীপ ঘোষাল,
২০/২০এ, শীল লেন,
কলকাতা-৭০০০১৫।

জনবিস্ফোরণের মতো সমস্যা এখনও অবহেলিত

অশোক কুমার মণ্ডল

ভারতবর্ষ উন্নয়নশীল দেশ। প্রগতির রূপরেখায় বেড়েছে শহর থেকে নগরের সংখ্যা, গগনচুম্বী অট্টালিকা, স্মার্টসিটি, পাতাল রেল, মনোরেল, ফ্রেট করিডর। বুলেট ট্রেন করতে চলেছি, চন্দ্রাভিযানের পর মঙ্গল গ্রহে যান পাঠিয়েছি, পৃথিবীর ধনী দশজনের তালিকায় দু'জন ভারতবাসী— যা প্রকৃতই গর্ব ও গৌরবের বিষয়।

একদিকে প্রাচুর্য-আড়ম্বর, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, অপুষ্টি, শিশুমৃত্যু, কৃষকের আত্মহত্যা, সন্তান বিক্রয়, অনাহারে মৃত্যু আজও দগদগে ঘা হয়ে দেখা দেয়। বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষুধার্তের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। সংখ্যা ৪০ কোটি। যা বিশ্বের তিন ভাগের এক ভাগ। আমেরিকার সমান। বিশ্বের প্রতি পাঁচটি অপুষ্ট শিশুর দুটি আমাদের। তিনজন মহিলার মধ্যে দু'জন ভারতীয় মহিলা রক্তাল্পতায় ভোগে (রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবোন্নয়ন রিপোর্ট)। 'অসুখী ভারত' বিশ্বের তেত্রিশ নম্বরে। বাংলাদেশ-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কারও পিছনে। একটা দেশের ৪০ শতাংশ মানুষকে অনুন্নয়নের অন্ধকারে রেখে সার্বিক উন্নতি সম্ভব কি? ব্যঙ্গচ্ছলে বলা যায় ভারতবর্ষ— "Rich nation with poor people," প্রশ্ন জাগে স্বাধীনতার ৭১ বছর পরেও প্রগতির সুফল সকলে পায়নি কেন?

'জনস্ফীতি' নামক মারণব্যাধি— যা জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ— ভোটসর্বস্ব সংকীর্ণ চিন্তায় আর কতকাল তাকে উপেক্ষা, অবহেলা চলবে? মানবসম্পদ উন্নয়নের বিভিন্ন মানদণ্ডে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমরা চীন-জাপান-ফ্রান্সেরও পিছনে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে থাকলে ভারত ইউরোপীয় দেশগুলোর উন্নয়নের সমান-সমান থাকত, একথা বলাই বাহুল্য।

এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসাবে উন্নীত হতে গেলে আর্থিক সংস্কারের সঙ্গে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ জরুরি। জনস্ফীতির কারণে আমরা নিজেরাই নিজেদের অনুন্নয়ন, অভাব- অনটনের স্বীকার। রাজনীতির কারণে রাষ্ট্রনায়কদের দুর্বলতা ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে জন-পরিষেবার নামে আই.সি.ইউ.-র রোগীর মতো গরিবদের বাঁচিয়ে রাখা যায়। বাঁচার-বাঁচা কাকে বলে তার স্বাদ পাওয়া যায় না। জনগণের রক্ত জল করা কর বাবদ প্রদেয় অর্থে মুমূর্ষু রোগীর অক্সিজেন সম দান-খয়রাতিতে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন হয় না। অর্থনীতি খাদের কিনারায় পড়ে, রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের ৫০০-র বেশি জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ভরতুকি দিতেই রাজকোষ ফাঁকা। এ যেন ড্রেজিং করে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির।

সাময়িক অভাব-অনটনের মুক্তি নয়। চাই সর্বজনীন স্থায়ী ব্যবস্থা। চাই স্বচ্ছল, সাবলীল, স্বনির্ভরতা। চাই জীবিকার সঙ্গে সুন্দর-মর্যাদাসম্পন্ন-অমৃতময় জীবন। তবেই গড়ে উঠবে সুস্থ-সমৃদ্ধ সমাজ। ইংরেজিতে বলা যায়— "Total development of a state or a country is fully depends on its good citizens."

উন্নয়ন-সমৃদ্ধি-বিকাশের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিশনের পণ্ডিতগণ সমস্যার উৎসে না গিয়ে নতুন-নতুন পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছেন— যা অবাস্তব। 'বড় পরিবার-কম রোজগার'-অপুষ্টি- অশিক্ষা-অভাব ঘুচবে কি? দেশের সমৃদ্ধির দিশা নির্দেশক দেশের 'যুব-সমাজ'। চীন-জাপানের তুলনায় আমাদের শিক্ষিত, যোগ্যতা সম্পন্ন যুবক-যুবতীর সংখ্যা অধিক। এই মানব সম্পদের ব্যবহার জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক হতে পারত। বাস্তবে দেখছি চাকরি না পেয়ে তারা আত্মঘাতী হচ্ছে, মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে। যুবসমাজ বিভ্রান্ত— দিশেহারা-নেশাগ্রস্ত। চাকরি না পেয়ে খোদ কলকাতার রাজপথে শিক্ষিত বেকাররা 'জুতো পালিশ' করে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এসএসসি পরীক্ষায় গ্রুপ ডি-র ৩৮০০ শূন্যপদে ১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী কীসের ইঙ্গিত বহন করে? উত্তরপ্রদেশে ৮০০০ ডোমের শূন্যপদে এমএ/এমএসসি/পিএইচডি দরখাস্তকারী। সর্বোপরি রেলের ৭০ লক্ষ শূন্যপদে ২ কোটি আবেদনকারী।

গলা ফাটিয়ে, স্লোগান দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল— নানারকম আন্দোলন করতে পারি— সংবাদপত্রের প্রথম পাতার শিরোনাম দখল করতে পারি কিন্তু বেকারত্বের অবসান অধরাই থাকবে— কারণ জনবিস্ফোরণ। নেশায় আসক্ত ব্যক্তিরা যেমন শরীর, সৌন্দর্য, কর্মক্ষমতা, চিন্তাশক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলে নিয়ন্ত্রণহীন জনসংখ্যা ও পরিবার, সমাজ-স্বদেশকে ক্রমশ ক্ষীয়মান ও ন্যুব্জ করে তুলছে। বিপরীতভাবে বলা যায়--- দারিদ্র্য-বেকারী-অপুষ্টি— সব রকমের দূষণ, বিভিন্ন মারণ রোগ-বিপথগামিতা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মাওবাদী, সমাজবিরোধী ইত্যাদি সমস্যার মূলে— 'জনবিস্ফোরণ'। ট্রাফিকের লালবাতির নিষেধাজ্ঞা যেমন মান্য করা উচিত, অনুরূপ দেশের সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করাও উচিত। "To reduce the birth rate is essential for the up-lifting life style of the young couples as well as the interest of the nation as a whole. It is a challange to restrict the family to all ritght thinking persons."

দেশের জল-জলাভূমি-বনাঞ্চল-খনিজ দ্রব্যের সঙ্গে জনসংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। ছোট-ছোট শিশুদের স্কুল ব্যাগের ওজন কমানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে স্নায়ু ও শিরদাঁড়ার রোগ না হয়। অনুরূপভাবে জাতির মেরুদণ্ড সোজা রাখার প্রয়োজনে জনসংখ্যার চাপ কমানো দরকার নয় কি? তবেই স্মার্ট সিটির সঙ্গে স্মার্ট সিটিজেন গড়ে উঠবে।

জাত-পাত-ধর্মের বিভেদ এবং নিজ-নিজ দলের রঙিন চশমায় সমাচ্ছন্ন নেতৃবৃন্দের প্রাচীর ভেঙে যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণই প্রগতিশীলতা। বিরূপ সমালোচনা অথবা উদাসীন থাকা রক্ষণশীলতা —পিছু হটা। আইনি ব্যবস্থাই সব নয়। ব্যক্তিগত ও জাতিগত সমৃদ্ধির লক্ষে অচলায়তন ভেঙে কালের আহ্বানে সমভাগী হওয়া মানবিক কর্তব্য। সার্থক হবে বিবেকানন্দের সুস্থ-সবল-সুখী সমাজ ব্যবস্থা। ■

সরলাদেবী চৌধুরানী একটি স্ফুলিঙ্গের নাম

মালিনী চট্টোপাধ্যায়

সরলাদেবী চৌধুরানী (১৮৭২-১৯৪৫) বহু বিপ্লবীর নেপথ্য প্রেরণাদাত্রী ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের অনেক সঙ্গীতের সুরদাত্রীও। নানা বিদ্যায় পারদর্শিনী ঠাকুরবাড়ির নারীরা সে যুগে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সরলাদেবী অন্যতমা। তাঁর শিক্ষা, সঙ্গীত ও সাহিত্য রচনায় নৈপুণ্য এবং বর্ণময় জীবন আমাদের বিস্ময়ে আবিষ্ট করে।

সরলাদেবীর পিতা ব্যারিস্টার জানকীনাথ ঘোষাল এবং মাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ কন্যা, সে যুগের খ্যাতনামা লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী। রবীন্দ্রনাথের মতো সরলাদেবীও দাসীদের কোলেই মানুষ হয়েছেন। মায়ের পর্যাপ্ত স্নেহ না পাওয়ার বেদনা তাঁর মনে আজীবন সঞ্চিত ছিল। পরিণত বয়সে রচিত আত্মজীবনী 'জীবনের ঝরাপাতা'তে লিখেছেন, ''মায়ের আদর কি তা জানিনে, মা কখনও চুমু খাননি, গায়ে হাত বোলাননি।'' কিন্তু মায়ের গুণ তিনি পেয়েছিলেন, স্বর্ণকুমারী দেবী সুলেখিকা ছিলেন। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেই ভারতীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল'। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গীত রচনায় আগ্রহের পরিচয় এ উপন্যাসে পাওয়া যায় :

''রিমঝিম ঘন বরিষে—সখিলো
বিরহী নয়ন-পারা, ঢালিছে শ্রাবণধারা
কি জ্বলে মরমে জ্বালা, নিভাই কেমনে সে...''

এই সঙ্গীতটি অবলম্বনেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় 'রিমঝিম ঘন ঘন রে' সঙ্গীতটি রচনা করেন। সরলাদেবী মায়ের সাহিত্যপ্রতিভা পেয়েছিলেন। 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় তার অজস্র প্রবন্ধ ও 'আহিতাগ্নিকা' নামক কবিতা, কবিতাটি পড়ে স্বয়ং বিবেকানন্দ মুগ্ধ হন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৪ এপ্রিল বিবেকানন্দ সরলাদেবীকে একটি পত্রে লেখেন : ''...যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞা কেউ এই সময়ে ইংল্যান্ডে যান, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসরে অন্তত দশ হাজার নরনারী ভারতে ধর্মগ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ...দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম প্রচার করিলে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পশ্চাৎভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে।'' কিন্তু সরলাদেবী বিবেকানন্দের সঙ্গী হয়ে ইংল্যান্ড যাত্রার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি।

সরলাদেবী সুদীর্ঘকাল 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাঁর সম্পাদনায় এই পত্রিকার চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। সরলাদেবী জানিয়েছেন, এ পত্রিকা আর নিছক সুকুমার সাহিত্যের রঙ্গভূমি থাকেনি। জাতীয়তার বাহন হয়ে উঠেছিল, পথে-ঘাটে যেখানে ইংরেজ-সৈনিক বা সিভিলিয়নদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে অপমানিত মানী ব্যক্তি স্বহস্তে সেই মুহূর্তে অপমানের প্রতিকার করেছেন—'ভারতী'র পাঠকদের কাছ থেকে সেসব বিবরণ চেয়ে পাঠালেন। পাঠকরা লেখা পাঠালেন এবং সে সমস্ত ইতিবৃত্ত ভারতীতে প্রকাশিত হতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে সুদীর্ঘকাল সুপ্ত গোপন আগুন সহসা জ্বলে উঠল। দলে দলে মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে শুরু করলেন। সরলা তাঁদের মধ্যে থেকে বেছে একটি দল গঠন করলেন। সরলার নির্দেশে ভারতবর্ষের মানচিত্রকে প্রণাম করে তাঁরা শপথ করলেন, তনু-মন-ধন দিয়ে ভারতবর্ষের সেবা করবেন। তাঁদের হাতে সরলা রাখি বেঁধে দেন। এদের মধ্যে অনেকে পরে খ্যাতনামা হন।

সরলাদেবী প্রতাপাদিত্য উৎসব প্রবর্তন করেন। তাঁর নির্দেশে সমস্ত কলকাতা ঘুরে যেসব বাঙালি যুবক কুস্তিতে পারদর্শী, তলোয়ার, খেলতে পারে, বক্সিং করে কিংবা লাঠি চালানোয় দক্ষ, তাঁদের খুঁজে বের করা হয়েছিল। তাদের খেলার প্রদর্শনী হয় এবং সরলাদেবী তাদের এক একটি মেডেল দেন। রবীন্দ্রনাথ এতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রতাপাদিত্য কখনও কোনও জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না। সরলাদেবী বলেন, ''আমি তো প্রতাপাদিত্যকে moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি। তিনি যে... বাংলার শিবাজী ছিলেন, মোগল বাদশার বিরুদ্ধে একা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামের সিক্কা চালিয়েছিলেন, সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি।''

একই সঙ্গে সরলাদেবী আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের প্রবর্তন করেন। তরুণরা অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করতেন এবং উৎসবে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তিনি পুরস্কার ও বীরাষ্টমী পদক প্রদান করতেন। এই অনুষ্ঠানে দেশের প্রাচীন বীরদের বন্দনা স্তোত্র গাওয়া হতো।

সুরারোপের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল সরলাদেবীর। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশে হাফেজের কবিতায় সুরারোপ করে মাতামহকে মুগ্ধ করেন। সরলাদেবী নতুন নতুন গান ও গানের সুর আহরণ করতেন। পথে গান গেয়ে যাওয়া বাঙালি বা অবাঙালি ভিখিরি, কখনও বা নৌকোর মাঝিকে পয়সা দিয়ে তাদের গান শুনতেন। মহীশূর বাসকালেও অজস্র গান শিখেছিলেন। সেসব সুর রবীন্দ্রনাথকে শোনাতেন। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধচিত্তে নিজের কথায় সেই সুর বসিয়ে নতুন সঙ্গীত রচনা করতেন।

১৯০৫-এ পঞ্জাবের আইনজীবী ও জাতীয়তাবাদী নেতা রামভুজ দত্ত চৌধুরীর সঙ্গে পরিণয়ের পর লাহোরে অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছিলেন সরলাদেবী।

সরলাদেবীর চরিত্র আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। প্রবল ইচ্ছাশক্তি থাকলে জন্ম ও মৃত্যুর এই মাঝের সময়টিকে মেয়েরা যে কত সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলে দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োগ করতে পারে, সরলাদেবীর জীবন তার প্রমাণ। ■

পরিমিত মদ্যপানেও হতে পারে ক্যান্সার

ডাঃ জয়দীপ পাত্র

সামান্য রেড ওয়াইনে নাকি ভালো থাকে হার্ট। অল্পস্বল্প বিয়ার সেবনে নাকি ঠাণ্ডা থাকে শরীর। পরিমিত স্কচ খেলে নাকি চাঙ্গা থাকা যায় বয়সকালেও। ব্রান্ডিতে নাকি সর্দিকাশি এড়ানো যায়!

এহেন চিন্তাভাবনা এখন অতীত। তামাকের সঙ্গে এবার একই বন্ধনীতে চলে এল সুরা। অন্তত কর্কটরোগের নিরিখে তো বটেই। পরিমিত মদ্যপানের অভ্যাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করে এই প্রথম আন্তর্জাতিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে একথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছে আমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি (অ্যাসকো)।

ক্যান্সার চিকিৎসার জগতে ওই সংস্থার যে বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞান পত্রিকা রয়েছে, সেই জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজিতে অ্যাসকোর বিশেষ প্রতিবেদন হিসেবে সদ্য দাবি করা হয়েছে, প্রায় ৬ শতাংশ ক্যান্সারের নেপথ্যে সরাসরি রয়েছে অ্যালকোহলের প্রভাব। সেই তালিকায় স্তন থেকে শুরু করে মুখ, গলা, খাদ্যনালী, লিভার, পাকস্থলী, অন্ত্র ও অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সারও রয়েছে। বলা হয়েছে, মদ্যপানের পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক হারে বাড়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি। সেই সূত্রেই বলা হয়েছে সবচেয়ে বড় কথাটা। ডাক্তারবাবুর পরামর্শে অত্যন্ত পরিমিত মদ্যপানের বিষয়টিকে কাঠগড়ায় তুলে বলা হয়েছে, ক্যান্সারের ঝুঁকি তাতে কমে না একটুও। বরং মদ্যপানের প্রতি এই 'দুর্বলতা'কে একরকম বিপজ্জনক আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, সুরাও যে ক্যান্সারের জন্ম দিতে দারুণভাবে সক্ষম (পোটেন্ট কার্সিনোজেনিক), সে সম্পর্কে অজ্ঞ সিংহভাগ চিকিৎসকও।

অ্যাসকোর এই বিশেষ 'স্টেটমেন্ট' আন্তর্জাতিক মহলে ছড়িয়ে পড়তেই আলোড়ন পড়ে গিয়েছে সর্বত্র। ব্যতিক্রম নয় কলকাতাও। কেননা, চিকিৎসকরা এখানে প্রায়ই পরিমিত মদ্যপানের পক্ষে বলে থাকেন। অনেকেরই বক্তব্য, শীতকালের সকালে দুধে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে খেলে শ্বাসনালীর সংক্রমণ এড়ানো যায় কিংবা ভর্তি পেটে দৈনিক এক-দেড় পেগ (৬০-৯০ মিলিলিটার) মদ্যপানে রক্তসঞ্চালন ভালো হয়, অথবা গ্লিসারলমুক্ত বিয়ার সেবনে পেট ভালো থাকে। এমনকী, কয়েকদিন আগে সায়েন্স সিটিতে আয়োজিত ফুসফুস রোগ বিশেষজ্ঞদের একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে বলা হয়েছিল, ধূমপানের চেয়ে মদ্যপান মন্দের ভালো। কিন্তু অ্যাসকো সাফ জানাচ্ছে, এসব ভ্রান্ত ধারণা থাকা মানে আখেরে ক্যান্সারকেই আমন্ত্রণ জানানো।

টাটা মেডিক্যাল সেন্টারের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বিভাস বিশ্বাসের কথায়, 'জনমানসে পরিমিত মদ্যপান নিয়ে হরেক জনশ্রুতি আছে। সেইসব ধারণা থেকে অনেক ডাক্তারবাবুও মুক্ত নন। এবার হয়তো অ্যাসকোর প্রতিবেদন থেকে সবাই শিক্ষা নেবে।' তিনি জানান, ব্যক্তিগত ভাবে তিনি কখনও মদ্যপানের পক্ষে কাউকে পরামর্শ না-দিলেও, সুরায় যে এতবড় ক্যান্সারের ঝুঁকি লুকিয়ে রয়েছে, তা জেনে কিছুটা চমকেই গিয়েছেন। অ্যাসকোর সাম্প্রতিকতম এই দাবিতে বিস্মিত সিংহভাগ চিকিৎসকই। এসএসকেএমের জেনারেল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক তথা স্তন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ দীপ্তেন্দ্র সরকার বলেন, 'অনেকেই প্রশ্ন করেন, সামান্য সুরাসেবন সত্যিই স্বাস্থ্যকর কিনা? এর উত্তরে কাউকে কাউকে উৎসাহ দিই না এই কারণে যে, একটা সময়ে পরিমিত মদ্যপানই হয়তো অপরিমিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু অ্যাসকোর সমীক্ষা যে চলতি ধারণার একেবারে ১৮০ ডিগ্রি উল্টো, সেটাই চিকিৎসকদের কাছে সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঠেকেছে।

প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ প্রকাশ মল্লিক। যিনি দীর্ঘদিন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে ক্যান্সারের চিকিৎসা করেন, জানাচ্ছেন, মদ্যপানের প্রভাবে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি সম্পর্কে একটা আবছা ধারণা ছিল বটে। জানা ছিল, লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে এক সময়ে ক্যান্সারও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে যে এত রকমের ক্যান্সারের জন্য ইথাইল অ্যালকোহলই সরাসরি দায়ী, তা কারও জানা ছিল না।

ক্যান্সার সার্জেন গৌতম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পশ্চিমের দেশের আমজনতা গড় ভারতীয়ের চেয়ে বেশি মদ্যপান করেন বটে। কিন্তু আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যেহেতু সাধারণ স্বাস্থ্যের মান অপেক্ষাকৃত খারাপ, তাই ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে আমাদের দেশের লোকের এই ঝুঁকি আরও অনেক বেশি।'

তবে অ্যাসকোর প্রতিবেদন বলছে, তামাকের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম মৌলিক ফারাক রয়েছে অ্যালকোহলের। মুখ্য প্রতিবেদক, উইসকনসিন-ম্যাডিসন বিশ্ববিদ্যালয়ের এমডি চিকিৎসক নোয়েল লো'কোন্টে লিখেছেন, তামাক সেবনকারীদের সকলেরই যেমন সমান ঝুঁকি থাকে ক্যান্সারের, মদ্যপানের ক্ষেত্রে ঠিক তা নয়। মদ্যপান কম করলে ঝুঁকি কম, মাঝারি করলে ঝুঁকি মাঝারি আর বেশি করলে ঝুঁকিও বেশি। দৈনিক মদ্যপানের যে সীমা (পুরুষ ১২০ মিলি ও মহিলা ৬০ মিলি) আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন, আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি এবং মার্কিন স্বাস্থ্য ও মানবসম্পদ মন্ত্রক সুপারিশ করে, তাকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই অভ্যাসকে 'ক্যান্সারের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ' বলা হয়েছে প্রতিবেদনে। বলা হয়েছে, এর চেয়ে কম মদ্যপান করলেও ঝুঁকিটা রয়েই যায়। ■

ভাগাড় কাণ্ডে কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরবে

দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়

যে দেশে শকুনি মন্ত্রী, রাজা দুর্যোধন সেখানে যে ভদ্রলোকেদের বাস করতে নেই সেই সাবধানবাণী আমাদের কবেই শুনিয়ে গেছেন কাশীরাম। তবে শতকের পর শতক পেরিয়ে এই অমৃতকথা শোনানো কবিটির ভূমে শকুনির অনুসারীরা যে একদিন শকুনের মুখের গ্রাসও কেড়ে নেবে তা নিশ্চয়ই মহাকবির কল্পনাতেও আসেনি। তারপর ভাগীরথী দিয়ে অনেক জল চলে গেছে। রূপসী বাংলায় বসে অনন্ত ডুব সাঁতারের কবি দেখেছেন অদ্ভুত আঁধার। যাদের হৃদয়ে প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আড়োলন নেই, দুনিয়াদারিতে তাদের আধিপত্য প্রত্যক্ষ করেছেন মহাকবি জীবনানন্দ। একই সঙ্গে দেখেছেন স্বাভাবিক চিন্তায় মানুষের হৃদয় কীভাবে শকুন ও শেয়ালের খাদ্য হয়। তারপর রূপসার ঘোলা জলে, জলঙ্গীর ঢেউয়ে আলোড়ন তুলে কেটে গেছে সময়। রূপসী বাংলা আর কল্লোলিনী তিলোত্তমার ঘুম ভেঙেছে নজিরবিহীন খবরে...

ছেলের প্রিয় চিকেন রোল, মেয়ের মাটন বিরিয়ানি, গিন্নির চিলি পর্ক আর নিজের চিকেন মাঞ্চুরিয়ান। সপ্তাহান্তে কলকাতার ছোটো থেকে বড়ো রেস্তোরাঁগুলোর বাইরে লাইন পড়ে। যাদের যেমন রেস্ত তেমনই তাদের রেস্তোরাঁ। তাই ছোটো থেকে বড়ো সবকটি রেস্তোরাঁ ভিড়ে ঠাসা। বাইরে লম্বা লাইন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বিরিয়ানির দোকানে ভিড়। অফিস ফেরতা খাওয়া মানেই চটজলদি রোল। পরম বিশ্বাসে, সপরিবারে তারা দুপুরের অথবা রাতের ভোজ সারতে যায় বাড়ির বাইরে। ইটিং আউট বা ডাইন আউট। তারা পাড়ার রেস্তোরাঁকে বিশ্বাস করে। পাড়ার 'রেস্টুরেন্টের' মালিক পরিচিত। তার থেকেও বেশি বড়ো মাপের 'রেস্ত্রঁ'কেও বিশ্বাস করে। কারণ এই সংস্থাগুলি উচ্চমানের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। কোথাও চোখ ধাঁধানো আলো, কোথাও বা মায়াবি। কোথাও সুবেশা সুশ্রী রিসেপসানিস্ট, কোথাও টাই পরা ম্যানেজার। এইসব তাদের আশ্বস্ত করে।

পাড়ার পোলট্রিতে ভোরবেলা মুরগির গাড়ি ঢুকেছে। গাড়ি থেকে মাল (মুরগি) নামানো মাত্রই মন্টুদা বসে মুরগির পালক ছাড়াত। এত ভোরে কাজ শুরু! বিয়ে বাড়ির অর্ডার আছে বুঝি! মন্টুদা, তার সহকারী, ম্যাটাডোরের ড্রাইভার সবাই চুপ। গাড়িতে আসতে আসতে যে সব মুরগি পথেই মরে গেছে সেগুলোকে সকাল সকাল কেটে চালান দেওয়া হবে লোকাল রেস্তোরাঁয়। অনেক অনেক কম দামে।

মুরগির এহেন মৃত্যু ও হোটেল কারবারিদের বাড়তি লাভ এবং রাজ্যের খাদ্য রসিকদের পাচন রসের গুণ ব্যবসায়ীদের ভাগাড়মুখী করল।

পৃথিবীর কোনও দেশে এমন কাণ্ডের নজির নেই। কতটা শিথিল প্রশাসন। কতটা উদাসীন প্রশাসন ও কতটা অসৎ প্রশাসন হলে এমন কাণ্ড সম্ভব হয় তা কল্পনা করতেও মনের জোর লাগে। ১০ বছর ধরে ভূমি-সংস্কারগর্বী বাংলায়, কন্যাশ্রীগর্বী বাংলায় এই কাণ্ড চলছে। তৃণমূলের ৬ বছর আর বামেদের ৩৪ বছর শাসনকালে বাঙালির ভাগাড় ভোগ চলছে। এই দশ বছরে পুলিশ থেকে পৌরপিতা কিছু জানতেন না একথা হ্যারি পটারে মজে থাকা শিশুও বিশ্বাস করবে না।

তবে এই কারবারে হ্যাপা কম নেই। খরচও আছে। ভাগাড়ে যখনই কোনও মৃত পশু পড়ছে তখনই সেখানে উপস্থিত একজন খবর দিয়ে দিচ্ছে কারবারিকে। ভাগাড়ে গোরু, শুয়োর, মোষ, ছাগল ইত্যাদি পড়ার খবর শকুন পাওয়ার আগেই পেয়ে যাচ্ছে সেইসব ব্যবসায়ী। তারা দ্রুত চলে আসছে ভাগাড়ে। তবে ভাবার কোনও কারণ নেই যে এই খবর তারা মাগনায় পেয়ে যাচ্ছে। যে লোকটি খবর দিচ্ছে, মিডিয়া যার নাম রেখেছে লিঙ্কম্যান, তার দক্ষিণা তো আছেই, সঙ্গে পাড়ার নেতা, এলাকার দাদা, থানা, পুরসভার জন্য বাড়তি খরচ থাকাও বিচিত্র নয়। তারপর রেফ্রিজারেটরের খরচ। বিদ্যুতের খবর। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পচন আটকাতে গিয়ে তিন রকম রাসায়নিকের খরচ। এত সব খরচ করেও কিন্তু লাভ থাকে। আর সেই লাভের জন্য মানুষের স্বাস্থ্যের চিন্তা, রুচির চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে সাধারণের চোখের আড়ালে রমরমিয়ে চলছে ভাগাড়ের পাঁঠা

কোল্ড স্টোরেজ থেকে মাংস বাজেয়াপ্ত করছে পুলিশ।

চচ্চড়ি। এই পচা বাজারের খবর যারা রাখে তারা জানাচ্ছে এই রকম :

ভাগাড়ের পচা মাংস বিক্রি করেই মোটা টাকা মুনাফা করত এক শ্রেণীর অসাধু চক্র। প্রতিদিন শহরে জেলার খামারগুলি থেকে লরি ভর্তি মুরগি ঢোকে। কলকাতায় আনার সময় রাস্তাতে প্রচুর মুরগি মরে যায়। সেই মরা মুরগি অসাধু ব্যবসায়ীরা হাফ দামের থেকে কম দামে কিনে নেন। তারপর সেই মরা মুরগি চলে যায় শহরের বিভিন্ন হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। প্রতি কিলো মরা মুরগি শহরের রেস্তোরাঁ মালিকের ৮০ টাকার কম বেশি দামে কেনে। তারপর অনেক রেস্তোরাঁ মালিক বা কেটারাররা বিভিন্ন ফার্ম মালিকদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখে। খামারে মুরগি মারা গেলে, সেই মুরগি সরাসরি কিনে নেওয়া হয়। দাম পড়ে ৬০ টাকা প্রতি কিলো। ভাগাড়ের গোরু, মোষ, শুয়োর বিক্রি হয় থৌকো হিসেবে। সেক্ষেত্রে বাজারে গোরুর মাংস ১৬০ টাকা প্রতি কিলো হলে ভাগাড়ের মরা গোরুর দাম পড়ে কিলো প্রতি মাত্র ৬০ টাকা।

এই হিসেব থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না ভাগাড়ে পচা কারবারীদের কীসের এত আঠা! এদিকে ভাগাড়ের দুষণ ও আরও ক্ষতিকর জীবাণুর কথা না জেনেই গলাধঃকরণ করে সাধারণ মানুষ। বেড়ালের বিষ্ঠা থেকে ও মরা বিড়ালের শরীর থেকে বিষ ছড়াচ্ছে। কলকাতার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের শরীরে মিলেছে টক্সোপ্লাজমোসিসের অস্তিত্ব।

এই ভাগাড় কাণ্ডকে কেন্দ্র করে কতগুলি প্রশ্ন উঠে আসছে। প্রথমত, কলকাতা পুরসভার একটি এনফোর্সমেন্ট বিভাগ আছে। এই শাখার কাজ হলো কলকাতা শহরের বিভিন্ন রেস্তোরাঁ, খাদ্যবিপণী এবং বাজারগুলিতে নজরদারি চালিয়ে জাল ও ভেজাল খাদ্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা। ভাগাড় কাণ্ডে যেসব তথ্যপ্রমাণ উঠে আসছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে— গত দশ-এগারো বছর ধরেই এই ভাগাড়ের পচা মাংস আমাদের পাতে পড়ছে। অথচ এই দশ-এগারো বছরে এমন কোনও নিদর্শন নেই যে বলা যেতে পারে পুরসভার এনফোর্সমেন্ট শাখা তল্লাশি চালিয়ে এর সামান্য আভাস পেয়েছে। পায়নি। কেন পায়নি? এখানে লুকিয়ে রয়েছে আর এক দুর্নীতির চক্র। সরষের মধ্যেই ভূতের বাসা যদি কোথাও থেকে থাকে— তবে তা লুকিয়ে আছে এই এনফোর্সমেন্ট শাখাতেই। পুরসভার এনফোর্সমেন্ট শাখা সম্বন্ধে কান পাতলে অনেক অভিযোগই শোনা যায়। তার মধ্যে একটি প্রধান অভিযোগ হলো, এই শাখার ফুড ইন্সপেক্টরদের ঘুষ দিয়ে অনেক রেস্তোরাঁ এবং দোকান মালিক শংসাপত্র আদায় করে নেয়। ভাগাড় কাণ্ডে আজ যারা জড়িত তারাও যে এই ফুড ইন্সপেক্টরদের ঘুষ দিয়ে গত দশ-এগারো বছর পচা মাংসের কারবার চালিয়ে আসেনি— তা আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। বরং, তদন্ত চালাতে গেলে কেঁচো খুঁজতে কেউটে বেরিয়ে আসারই সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়ত, সমস্ত রকম বেআইনি এবং অসৎ কারবারের পিছনে পুলিশ এবং একশ্রেণীর অসাধু রাজনীতিকের যোগ থাকে। ভাগাড় কাণ্ডে ইতিমধ্যেই সিপিএমের এক প্রাক্তন কাউন্সিলর ধরা পড়েছেন। এই কাণ্ডে ইনি শুধু একাই জড়িত এরকম ভাবতেও কষ্ট হচ্ছে। দশ-এগারো বছর ধরে ভাগাড় কারবারিরা বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং পুলিশের একাংশকে খুশি না করে নিরুপদ্রবে কারবার চালিয়ে গেছেন— বিষয়টা বোধহয় তাও নয়। যদি ঠিকঠাক তদন্ত হয়— তাহলে অনেক রাঘব বোয়ালের নামই এই তদন্তে হয়তো উঠে আসবে। কিন্তু প্রশ্ন, এই তদন্ত ঠিকঠাক হবে কি? কারণ, ভাগাড় কাণ্ডে যারা ধরা পড়েছে— তারা যথেষ্টই অর্থবান এবং প্রভাবশালী। ইতিমধ্যেই তাদের হয়ে লড়তে বাইশজন আইনজীবী দাঁড়িয়ে গেছে।

সর্বশেষ প্রশ্নটি রাজনীতির। ভাগাড় কাণ্ডে যারা ধরা পড়েছে--- তাদের অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ের। আর যে মাংস বাজেয়াপ্ত হয়েছে তার গরিষ্ঠাংশই গোরুর। এর পরই বামপন্থীদের একাংশ এর ভিতর 'হিন্দুত্ববাদীদের ষড়যন্ত্র' আবিষ্কার করতে উঠে পড়ে লেগেছে। অথচ ভাগাড় কাণ্ডে তল্লাশি চালিয়ে রাজ্যের পুলিশই এদের গ্রেপ্তার করেছে। রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এই ভাগাড় কারবারিরা। এদের আড়াল করতে এখন বাজারে নেমেছে বামপন্থী, অতি বামপন্থীরা। রাজ্যের মানুষের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই বামপন্থীদের। তাদের যত দরদ ভাগাড়-ব্যবসায়ীদের প্রতি! বোঝাই যায় সেকুলার এবং বামপন্থীদের শেষ গন্তব্য ওই ভাগাড়ই। ■

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ভাগাড়ের বিষ তাড়াতে শক্তিশালী বিষ প্রয়োগ

সুবিমল মুখোপাধ্যায়

দশ বছর ধরে বাঙালি রেস্টুরেন্টে গিয়ে কবজি ডুবিয়ে মটন রেজালা খেয়েছে। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি জিভে জল আনা মাংস রান্না করা হয়েছে ভাগাড়ে ফেলে দেওয়া পশুর মাংস নিয়ে। ভাগাড় সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকেরই কমবেশি ধারণা আছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় নাকে রুমাল চাপা দিতে হয়। সাধারণভাবে মৃত পশু যেখানে ফেলা হয় তাকেই ভাগাড় বলে। এইসব মৃত পশুর মধ্যে গোরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, শুয়োর— সবই থাকে। একবার ভাবুন তো, একদল লোক টাকার জোরে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের মুখ বন্ধ করে ভাগাড় থেকে ওই মৃত পশুগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে চালান করছে। কারণ মোটা মুনাফা। মানুষের স্বাস্থ্য নিয়ে তাদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

প্রশ্ন হলো, দশ বছর ধরে যারা নিয়মিত রেস্টুরেন্টে এইসব খাবার খেয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য কতটা সুরক্ষিত? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে ভাগাড় থেকে তুলে আনা মাংসের প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিটা একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে। কলকাতা পুলিশের এক পদস্থ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে বলেন, 'ভাগাড়ের কারবারিরা প্রথমে ফরম্যালিন দিয়ে মৃত পশুর মাংসটা ধুয়ে ফেলে। তারপর চর্বি ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। প্রক্রিয়াকরণের এই পর্বে মাংসের পচন ঠেকাতে ক্যালসিয়াম প্রোপিওনেট ইনজেকশন দেওয়া হয়। এরপর দুর্গন্ধ দূর করার জন্য ব্যবহার করা হয় অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এবং লেড সালফেটের মিশ্রণ। প্রক্রিয়াকরণ শেষ হবার পর প্যাকিং করে ওই মাংস পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে।'

চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের অনেকেরই অভিমত, মাংস প্রক্রিয়াকরণে যেসব রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় তার প্রত্যেকটাই বিষ। মানব শরীরে এদের ক্ষতিকর প্রভাব ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। যেমন ফরম্যালিনের কথাই ধরা যাক। চিকিৎসা পরিভাষায় ফরম্যালিনকে বিরল শ্রেণীর বিষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। খাবারের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ ফরম্যালিনও যদি শরীরে প্রবেশ করে তাতে গ্যাস্ট্রাইটিসের মতো অসুখ হতে পারে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে প্যানক্রিয়াস, লিভার এবং মেয়েদের ফ্যালোপিয়ন টিউব। ফুসফুসের কোনও রোগে ফরম্যালিন ইনজেকশন দিলে ব্রঙ্কাইটিস কিংবা নিউমোনিয়া হতে পারে। লিভারের আচরণগত পরিবর্তন হতে পারে। ক্ষতি হতে পারে কিডনিরও। এই কারণেই ডাক্তারবাবুরা ফরম্যালিনকে টক্সিকের (বিষ) পর্যায়ে ফেলেন। বাঙালির দুর্ভাগ্য, তার প্রিয় মটন বা চিকেন প্রথমেই ধোয়া হতো ফরম্যালিন দিয়ে। অর্থাৎ বিষে বিষে বিষক্ষয়ের প্রথম ধাপেই ছিল ফরম্যালিনের স্থান।

ক্যালসিয়াম প্রোপিওনেটের ধাক্কাটা আরও জোরালো। এর প্রভাবে পাকস্থলীতে আলসার হতে পারে। এছাড়া রয়েছে আচরণগত পরিবর্তন। ডাক্তারবাবুরা জানিয়েছেন, ক্যালসিয়াম প্রোপিওনেটের অতিরিক্ত ব্যবহারে হতাশা, অবসাদ এবং ইনসমনিয়ার মতো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। যখন তখন তীব্র মাথার যন্ত্রণা এই রাসায়নিকের আর একটি অবদান।

প্রক্রিয়াকরণের একেবারে শেষ পর্বে রয়েছে অ্যালুমিনিয়াম এবং লেড সালফেট। শেষেরটির অতিরিক্ত ব্যবহারে খিদে কমে যায়, ওজন কমতে থাকে, কলিকের যন্ত্রণা হয়, বমি-বমি ভাব হয়, অনবরত বমিও হতে পারে এবং পেশিতে খিঁচুনি হতে পারে। সব থেকে বড়ো কথা, লেড সালফেট একজন সুস্থ-সবল মানুষকেও শরীরে-মনে মারত্মক দুর্বল করে দিতে পারে এবং নষ্ট করে দিতে পারে হাত ও পায়ের মধ্যে সমন্বয়। অ্যালুমিনিয়াম সালফেট জলের সংস্পর্শে এলেই সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। এই অ্যাসিড শরীরে প্রদাহের সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়া অ্যালুমিনিয়াম সালফেটের অতিরিক্ত ব্যবহারে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হতে পারে। ত্বকের সমস্যা বাড়তে পারে। গলায় এবং ফুসফুসে জ্বলুনিও হতে পারে।

একটা কথা বলতেই হবে, যারা কালেভদ্রে রেস্টুর‍্যান্টে যান তাঁদের কোনও ভয় নেই। যাঁরা নিয়মিত রেস্টুর‍্যান্টে যান বা জাঙ্ক ফুড খান ভয় তাঁদেরই। ডাক্তারবাবুরা তাই নবীন প্রজন্মকে সতর্ক করে দিয়েছেন। অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড এমনিতেই স্বাস্থ্যকর নয়, মাংসের শুদ্ধতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন উঠে যাওয়ায় এখন তা একেবারেই অ-খাদ্য। সুতরাং সাধু সাবধান! বারবার বেলতলাতে না-যাওয়াই ভালো। ■

রাঙা মাটির দেশে কয়েকদিন

বেলা দে

ঘটনাটা দু'বছরের পুরনো। সেবার নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল বাঁকুড়ায়। ঠিক করেছিলাম অধিবেশনের পর রাঙা মাটির দেশে বেড়িয়ে আসব। আমার রথ দেখা কলা বেচা দুটোই হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। আমার ভ্রমণ শুরু হলো এক্তেশ্বর মন্দির দিয়ে।

সেদিন রবিবার। সকাল ৬টায় উঠে স্নান সেরে ঝটপট তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি মন্দিরের উদ্দেশে। মন্দির লাগোয়া দোকানে ফুল, মালা, বেলপাতা সব দিয়ে সাজানো ডালা কিনে পুজো দিয়েছি প্রাণভরে। শিবলিঙ্গ অনেকটা জল্লেশ মন্দিরের মতো, ভূগর্ভে অনেকটা নীচে হাত ঢুকিয়ে স্পর্শ করতে হয়।এবারের গন্তব্যস্থল মুকুটমণিপুর। একটা ভাড়া গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়েছি আমরা ৬ জন। বেলা তখন দশটা বাজে। বাঁকুড়ার উষ্ণতায় ঝলসে যাওয়ার কথা সে সময়। কিন্তু আমাদের ভাগ্যচক্রে বৃহস্পতি সহায়, সামুদ্রিক ঝড়ের কল্যাণে প্রাণ জুড়ানো দাক্ষিণ্য পেলাম। ছায়াঘেরা সুশীতল বাতাস, সূর্যদেব দাপট হারিয়ে মেঘের আড়ালে মুখ লুকিয়েছেন, প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের মাঝে কেউ আবেগে গান ধরেছে কেউ ক্যামেরাবন্দি করছে কংসাবতীর প্রান্তিক কোণে, রক্তমৃত্তিকার টিলার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা শ্যামল বনানী, সে এক স্বপ্নিল জগৎ। পথপাশে সোনাঝুরি গাছে ঝুলে থাকা হলুদ রঙা ফুল থোকা থোকা, বয়সকে পিছিয়ে কেউ ফিরে গেছে কিশোরী বেলায়, মাথায় গুজেছে গোছাধরা সোনাঝুরি ফুল। আগে বলা হয়নি ধলডাঙ্গা মোড়ে গাড়ি ছেড়ে উঠেছি ভুটভুটিতে, সে বাহনেই পৌঁছালাম কংসাবতীরপারে। ভুটভুটি চালক স্থানীয় ছেলে তার মুখেই শুনি কুমারী ও কাঁসাই দুই নদী একযোগে এখানে কংসাবতী নামে পরিচিত হয়েছে। জলাধার দেখে সমুদ্রই মনে হয়। সেখানে তিনটে দ্বীপ এক লাইনে। ওপারে আছে ডিয়ার পার্ক। কেউ কেউ নৌকাযোগে দেখেও আসছে।

আবার এসে চড়ি আজব গাড়ি ভুটভুটিতে। এবার যাব মুকুটমণিপুর। এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মাটির বাঁধ, তার উচ্চতা জানা হয়নি। উপরে উঠছি তো উঠছিই। সিঁড়ির একধারে সোনাঝুরি ফুলের গাছ অপর পারে সুদৃশ্য বিশ্রামের জায়গা। ওপর থেকে অদ্ভুত লাগছিল বিশালাকায় জলাধার, মাঝখানে সবুজ দ্বীপগুলি তার সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। বাঁধের অপর প্রান্তে যে সিঁড়ি রয়েছে সেটা দিয়ে নিচে নেমে ভুটভুটিতে চড়লাম। আবার সেই মনোরম রূপ হাপুস নয়নে উপভোগ করতে করতে পৌঁছে গেলাম ধলডাঙ্গা মোড়ে। এবার ভুটভুটির মায়া ছেড়ে ভাড়া চুকিয়ে নামলাম। পথের দুই ধারে বাঁকুড়ার হস্তশিল্প সম্ভারের সব দোকান, উপহার দেবার জন্য কেনাকাটা করলাম সবাই। সেদিন বাঁকুড়ায় শেষ দিন, পরদিন ভোরে রওনা হলাম বিষ্ণুপুর। বাঁকুড়ার এক ভূমিপুত্রের মুখে শুনি বাঁকুড়া নামের তাৎপর্য— শ্রীকৃষ্ণ বামদিকে অর্থাৎ রাধার দিকে মুখ হেলে দাঁড়িয়ে থাকেন বলে বামমুড়া। সেটা অপভ্রংশ হয়ে বাঁকুড়া হয়েছে। এই শান্ত সমৃদ্ধ লালমাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন বহু বড় বড় মনীষী— রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যদুভট্ট, শক্তিপদ রাজগুরু, শ্রীনিবাস আচার্য এবং মা সারদা। ধর্মচর্চা ও লোকসংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার এই জেলা। পোড়ামাটির কাজ, কাঠের কাজ, শঙ্খশিল্প, ডোকরাশিল্প বাঁকুড়ার অন্যতম আকর্ষণ।

প্রথম দর্শনীয় স্থান রাজবাড়ি সংলগ্ন মৃণ্ময়ী মায়ের মন্দির। মল্লরাজ জগৎমল্ল জয়পুর থেকে বিষ্ণুপুরে তার রাজধানী স্থানান্তরিত করলে ৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে রাজকার্যে সুবিধার জন্য এবং মৃণ্ময়ী মাতার স্বপ্নাদেশ পেয়ে রাজদরবারের পাশে মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলে কথিত। এই মূর্তি গঙ্গামাটির তৈরি। দোকান থেকে টেরাকোটার কিছু সামগ্রী কেনাকাটা করলাম। তারপর ঘুরে দেখি পাঁচচূড়া বিশিষ্ট শ্যামরাইয়ের মন্দির। টেরাকোটার কাজে সমৃদ্ধ মন্দিরটি ১৬৪৩ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠা করেন। গেলাম রাসমঞ্চের দিকে। মল্লরাজ বীরহাম্বির ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে এই মঞ্চটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুরে যাবতীয় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ

জনসাধারণের দর্শনের জন্য এখানে আনা হতো। এর নীচের বেদি খাকড়া পাথর আর উপরের স্থাপত্য ইটের। সৌধটি পিরামিডাকৃতি। সেখান থেকে বেরিয়ে পর পর বুড়িছোঁয়া করে দেখে নিলাম মদনমোহন মন্দির, জোড়বাংলা, রাধাশ্যাম মন্দির। আর একটু এগিয়ে গাড়ি থামল দলমাদল কামানের কাছে। দলমর্দন থেকে অপভ্রংশ হয়ে দলমাদল হয়েছে। দল অর্থাৎ শত্রু, মর্দন শব্দের অর্থ দমন। বিষ্ণুপুর মল্লরাজাদের অসংখ্য কামান ছিল। গুটি কয়েক ছাড়া সব কামানই নাকি ব্রিটিশ সরকার অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছে। ট্যুরিস্ট আকর্ষণের জন্য এই কামানটি কেবল বেদির উপর সংরক্ষিত রয়েছে। লোহা পেটাই করে এটি তৈরি, এর দৈর্ঘ্য ৩.৮ মিটার। ব্যাস ৩০ সেমি, ওজন তিনশো মন। পাশেই ছিন্নমস্তার মন্দির। সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরের তৈরি। মন্দির লাগোয়া অসংখ্য দোকান। টেরাকোটার সম্ভার, অপূর্ব সব কারুকার্য। প্রাচীন সব মন্দির গাত্রে মাকড়াপাথর ও পোড়ামাটির বিচিত্র কারুকার্য বিষ্ণুপুরকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এছাড়া বিষ্ণুপুরে বালুচরি ও স্বর্ণচরি শাড়ি বিশেষ আভিজাত্যের প্রতীক। বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরে শিল্পবৈশিষ্ট্য ছাড়া অন্যতম সংস্কৃতি সঙ্গীত, সঙ্গীতের বিশেষ ঘরানা 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' আজও শাস্ত্রীয় সংগীতের পরিমণ্ডল উচ্চাসন দখল করে আছে।

এগিয়ে চলেছি এবার জগজ্জননী মায়ের অর্থাৎ মা সারদার জন্মস্থান জয়রামবাটী দর্শনে। বিষ্ণুপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরত্ব। পৌঁছলাম ঠিক ১২টায়। মধ্যাহ্নে মায়ের ভোগ আরতি শেষে ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করছে। দুপুরে মা সারদা অভুক্ত কাউকেই না খাইয়ে ছাড়তেন না, প্রথা মেনে আমরাও খেতে বসে গেলাম। খিদের পেটে কিছু দেবমাহাত্ম্যে প্রসাদ অমৃত মনে হচ্ছিল তখন। ঘুরে ঘুরে মায়ের স্মৃতিজড়ানো বসতবাটি দেখতে দেখতে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল, তাহলে এতদিনে সত্যিই মায়ের কাছে আসতে পেরেছি। মাটির কুটিরগুলো অতীব সুন্দর ঝকঝকে পরিষ্কার। দোচালা শনের ঘর নিয়ম করে রক্ষণাবেক্ষণ হয়। এসময় মা বিশ্রাম করেন বলে বন্ধ থাকে, ঘর, বাড়ির উঠোন সব বাইরে থেকে দেখে এসেছি। বাড়ির বাইরে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে, সামনে মায়ের পুষ্করিণী তাতে খেলে বেড়াচ্ছে ছোটবড় হরেক প্রজাতির মাছ। পুকুরের সামনে একটা সুদৃশ্য ফুল বাগান। মা ফুলবাগান পরিচর্যা করতেন নিজ হাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ চলে যাবার পর দক্ষ হাতে পরিচালনা করেছেন সব। তিনি আর্থিক অনটনের মধ্যে জন্মালেও বড় হয়েছেন পরমার্থিক ঐশ্বর্যের মধ্যে। বস্তুরাজ্যে অভাব তার মুখের হাসিটুকু কেড়ে নিতে পারেনি। মা একদিন হয়েছেন পরিপূর্ণ জগন্মাতৃকা। মাত্র দেড় ঘণ্টা মায়ের শান্তির নীড় ঘুরে দেখে বাইরে বেরিয়ে আবার রক্তমৃত্তিকার ঐশ্বর্য হস্তশিল্প ও লোকশিল্প সম্ভার টেরাকোটা ও ডোকরার নিপুণ সাজসম্ভার উপকরণ ক্রয় করে, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে এলাম। তবু মনে হচ্ছিল মায়ের স্মৃতিবিজড়িত জন্মস্থান হয়তো অনেক অদেখা রয়ে গেল।

এবার গন্তব্য কামারপুকুর। হুগলী জেলার ছোট্ট এক গ্রামের সন্তান গদাধর একসময় দক্ষিণেশ্বরে পুরোহিত নিযুক্ত হয়ে কীভাবে স্বমহিমায় জগৎজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছেন।

জয়রামবাটী পিছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলেছে কামারপুকুরের দিকে। ঠিক বেলা আড়াইটে পৌঁছলাম ঠাকুরের বাড়ির দোড়গোড়ায়। সদর দরজা বন্ধ, সিকিউরিটির মুখে শুনলাম খুলবে বেলা চারটায়। সুতরাং অপেক্ষা ছাড়া আর উপায় নেই। এমন সময় অল্পবয়সী একটা মেয়ে এগিয়ে এল, নিজেকে গাইড বলে পরিচয় দিল, মেয়েটি কিশোরী হলে হবে কী

বিষ্ণুপুর রাসমঞ্চের সামনে লেখিকা।

ওর বাচনভঙ্গি এত সুন্দর আমরা প্রত্যেকে আকৃষ্ট হয়ে হাঁ করে গিলছি ওর কাছ থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবনের সব তথ্য। শুনতে শুনতে আমরা এগোচ্ছি আর দেখছি গদাইয়ের ছেলেবেলার পাঠশালা, সঙ্গীদের বাসগৃহ, খেলাধুলার বিচারণক্ষেত্র, ভূমিষ্ঠ হবার স্থান, হালদার পুকুর, গোপেশ্বর শিবমন্দির, সীতানাথ পাইনের বাড়ি, বুধুই মোড়লের শ্মশান (গদাধর প্রায়ই এই স্থানে ধ্যানমগ্ন হতেন)। দেখতে দেখতে বেলা ৪টা বাজল, সদর দরজা খুলতেই ডান হাতে দেখলাম ঠাকুরের সহস্তে লাগানো একখানা আমগাছ অদ্ভুত ভঙ্গিমা নিয়ে আজও বেঁচে আছে। মাঝখানটা কুমিরের পিঠের মতো তার দুই পাশ দিয়ে উঠেছে ডালপালা। বাঁ দিকে সুন্দর নাটমঞ্চ সেখানে গদাই শিব সেজে যাত্রা করতে গিয়ে একবার ভাবাবেগে স্বর্গীয় আভা দেখতে পেয়েছিলাম। এমনটা নাকি প্রায়ই হতো। নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে তার মুখোমুখি রামকৃষ্ণের মর্মর মূর্তি সমন্বিত মনোরম প্রস্তরমূর্তি, অতিথিভবন, গ্রন্থাগার, সবাই মোটামুটি দেখে নিলাম। ক্রমশ অন্ধকার ছায়া নেমেছে সুবুজঘেরা মন্দির চত্বরে। লাহাবাজার নামে কামার পুকুর চত্বরে বহু দোকান ও যাত্রীনিবাস গড়ে উঠেছে। সেখানকার জিলিপি, বোঁদের জন্য নাকি গ্রামখানি প্রসিদ্ধ।

বেশ কটাদিন পরে নিজের শহরকে কাছে পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হয়ে গেলেও মনটা কেবল পিছনে ফিরে দেখছিল লাল পাহাড়ির ছায়া। অরুণ চক্রবর্তীর গলা শুনতে পাচ্ছিল— ''লালপাহাড়ি দেশে যা, রাঙা মাটির দেশে যা''—

এই সময়

নিরাপদ আধার

কেন্দ্রীয় সরকারের আধার প্রকল্প সম্পূর্ণতই বায়ো আইডি ভেরিফিকেশনের কথা মাথায়

রেখে গ্রহণ করা হয়েছে। আধারের বিরুদ্ধে গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবার অভিযোগ একেবারেই টেকে না। সম্প্রতি একথা বলেছেন মাইক্রোসফ্‌টের প্রধান বিল গেটস।

সঙ্ঘ অবমাননা

মহারাষ্ট্রের ভিওয়ানদি আদালত কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর নামে সমন জারি

করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে অসম্মান করার অভিযোগ রয়েছে। আদালত তাঁর বক্তব্য রেকর্ড করতে চায়। সেই জন্যেই এই সমন।

সিনেমায় কার্গিল

কার্গিল যুদ্ধের নায়ক বিক্রম বাত্রার কথা

আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি। পরিচালক করণ জোহর তাঁর জীবন অবলম্বনে সিনেমা তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নামভূমিকায় অভিনয় করবেন সিদ্ধার্থ মালহোত্রা। উল্লেখ্য, বিক্রম বাত্রা শেরশাহ নামে পরিচিত ছিলেন।

সমাবেশ -সমাচার

নারদ জয়ন্তীতে 'আজীবন সাংবাদিকতা নারদ সম্মাননা-২০১৮' প্রদান অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সভাগৃহে এবং জলপাইগুড়ির সুভাষ সদনে ১ মে ব্রহ্মাণ্ডের আদি সাংবাদিক দেবর্ষি নারদের জন্ম জয়ন্তী পালিত হয়। সকাল ১১টায় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সভাগৃহে এবং বিকেল ৪টায় সুভাষ সদনে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও নিবেদিতা গবেষক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। শিলিগুড়িতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদপত্রের বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস সরকার এবং জলপাইগুড়িতে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি শহরের সম্মানীয় নাগরিক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক উমেশ চন্দ্র বর্মন।

দুটো অনুষ্ঠানেই স্বাগত ভাষণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সাধন কুমার পাল নারদ জয়ন্তী পালনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।

শিলিগুড়িতে বিশেষে অতিথি দেবাশিস সরকার তাঁর ভাষণে ঘরে-বাইরে বিপদের কথা উল্লেখ করে সাংবাদিকদের পেশাগত ঝুঁকি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা রন্তিদেব সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা বিশদভাবে তুলে ধরেন। দেশ-বিদেশের উদাহরণ তুলে ধরে সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধীনতার বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলতে বাস্তবে মালিক গোষ্ঠীর স্বাধীনতা বোঝায়।

এক শ্রেণীর সংবাদপত্র জম্মুর ধর্ষণ কাণ্ডে আইন লঙ্ঘন করে ধর্ষিতার নাম, ধর্মীয় পরিচয় এবং ছবি প্রকাশ করে দিয়ে কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে কীভাবে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে এই বিষয়টিও উল্লেখ করেন। শিলিগুড়িতে বিশিষ্ট প্রবীণ সাংবাদিক নিধুভূষণ দাসকে সাংবাদিকতা ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের জন্য পাঁচ হাজার টাকা সম্মাননা রাশিসহ 'আজীবন সাংবাদিকতা নারদ সম্মাননা-২০১৮' প্রদান করা হয় এবং বিভিন্ন মিডিয়া হাউস থেকে আগত ১০ জন মহিলা সাংবাদিক ও ১৩ জন যুবা সাংবাদিককে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়। জলপাইগুড়িতে ১৭ জন যুবা সাংবাদিককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ভিড়ে ঠাসা দুটো অনুষ্ঠানেই শহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

এই সময়

প্রধানমন্ত্রী সকাশে

সুপ্রিম কোর্টের মহিলা আইনজীবীদের একটি সংগঠন সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে ধর্ষকদের

কঠোরতম শাস্তি দাবি করে স্মারকলিপি জমা দেন। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিয়েছে। আইনজীবীদের অভিযোগ পাঠানো হয়েছে নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রকে। দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর।

শিক্ষায় ছাড়

যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত, নিখোঁজ কিংবা সারাজীবনের মতো পঙ্গু হয়ে যাওয়া সেনাদের ছেলেমেয়েরা

শিক্ষায় যে ছাড় পায় কেন্দ্রীয় সরকার তা বন্ধ করছে না। উল্লেখ্য, পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দার সিংহ এ ব্যাপারে কেন্দ্রকে অনুরোধ করেছিলেন।

কর্ণাটকে মোদী

কর্ণাটকে জেতার সম্ভাবনা যত বাড়ছে রাজ্য বিজেপি ততই আরও শক্তি বাড়িয়ে নির্বাচনী

যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কর্ণাটকে ১৫টি জনসভা করবেন। কিন্তু এখন তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ২১। কর্ণাটকে নির্বাচন ১২ মে।

সমাবেশ -সমাচার

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলন

গত ১৪-১৫ এপ্রিল স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের অখিল ভারতীয় মহিলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দিল্লির ছতরপুরে। সম্মেলনে সারাদেশ থেকে ৬০০ মহিলা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী শ্রীমতী মণিকা অরোরা। বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় মহিলা সংযোজিকা ড. অমিতা পতকী, সহ সংযোজিকা শীলা শর্মা, অলকা সৈনী, সুধা শর্মা। সম্মেলনে দেশী চিকিৎসা, পরিবার প্রবোধন ও মহিলা উদ্যোগ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। এই

আলোচনায় দেশী চিকিৎসাপদ্ধতি বিষয়ে অলকা সৈনী, মহিলা উদ্যোগ বিষয়ে মধুরাজ ও শ্রীকলমজিৎ এবং পরিবার প্রবোধন বিষয়ে রেণু পৌরাণিক বক্তব্য রাখেন। হরিয়ানা মহিলা আয়োগের উপাধ্যক্ষ প্রীতি ভরদ্বাজ মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার ওপর আলোকপাত করেন।

সম্মেলনে স্বদেশী জাগরণ মঞ্চের রাষ্ট্রীয় সংযোজক অরুণ ওঝা, সংগঠন সম্পাদক কাশ্মীরিলাল, সংযোজক সরোজ মিত্র, ড. অশ্বিনী মহাজন প্রমুখ বিশেষভাবে উপস্থিত ছিলেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বদেশী মঞ্চের দিল্লি প্রান্ত প্রমুখ পুনম লুথরা।

ডাক্তার সুজিত ধর স্মারক বক্তৃতা

গত ২৮ এপ্রিল কলকাতার স্যার আশুতোষ মুখার্জি মেমোরিয়াল প্রেক্ষাগৃহে এক অত্যন্ত সময়োপযোগী বক্তৃতার আয়োজন করে ডাঃ সুজিত ধরেরই নামাঙ্কিত ফাউন্ডেশন। বক্তৃতার বিষয় ছিল ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত ভারতীয় সংবিধানের সূচনাপত্রে পরবর্তী সময়ে যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংযোজন হয়েছে, সেগুলিকে পরিহার করে সংবিধানের সূচনাপত্রের পুনরুদ্ধার সম্ভব কিনা? শুরুতে ড. আম্বেদকর ও ডাঃ সুজিত ধরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন বিশিষ্ট অতিথরা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক বিমল শঙ্কর নন্দ তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসেন সংবিধানের বিতর্কিত ৪২ তম সংশোধনীর প্রসঙ্গ। ১৯৭৬ সালে জরুরি অবস্থার প্রেক্ষাপটে রাতারাতি সংবিধানে যে সোশ্যালিস্ট, সেকুলার শব্দগুলির অনভিপ্রেত সংযোজন হয় অধ্যাপক নন্দ তার নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, সেই সময় নির্বিচারে নাসবন্দির কারণে দেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, তা লাঘব করতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সেকুলার কথাটি ঢুকিয়ে দেন। একইভাবে কমিউনিস্টদের মন জোগাতে

এই সময়

বন্ধুত্ব

নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়েছে।

বেড়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন সার্বিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী এবং বিদেশমন্ত্রী ইভিকা ড্যাকিক। সুষমা স্বরাজের সঙ্গে এক আলাপচারিতায় তিনি ভারতের সঙ্গে সার্বিয়ার বন্ধুত্বের কথা বলেন।

খতম নকশাল

নকশালমুক্ত হবার লক্ষ্যে ছত্তিশগড় আরও এক ধাপ এগোল। সম্প্রতি নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর

হাতে তিনজন নকশাল নেতা মারা গেছে। এদের প্রত্যেকের নামেই আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল। নিহতদের মধ্যে দু'জন মারা গেছে কিসটারাম অঞ্চলে, একজন কানহাইয়াগুড়ার জঙ্গলে।

চতুর্থ স্তম্ভ

মিডিয়াকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের জেনারেল অ্যাসেম্বলি মে মাসের তৃতীয় দিনটিকে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে

হিসেবে ঘোষণা করেছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'স্বাধীন মিডিয়া শক্তিশালী গণতন্ত্রের প্রাণভোমরা স্বরূপ। মিডিয়ার স্বাধীনতা বজায় রাখতে আমাদের সকলকে দায়বদ্ধ হতে হবে।'

তিনি সোশ্যালিস্ট শব্দটিও সংযোজিত করেন। দীর্ঘ ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫০ সাল ব্যাপী ৪ বছরের নিরলস পরিশ্রমে সারা ভারতের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিদের জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমেই যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সংবিধান ও তার সূচনাপত্র রচিত হয় সে কথাও শ্রী নন্দের বক্তব্যে উঠে আসে।

ভারতের সংবিধান যে এই ভারতভূমির হাজার হাজার বছরের সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্মবোধেরই একটি সুসংহত প্রতিফলন ও জাতিকে কোন পথে এগোতে হবে তারই পথ-নির্দেশ, সেই সূত্রে মূল সূচনাপত্রে অঙ্কিত ছবিগুলি পাওয়ার পয়েন্টে প্রদর্শিত করেন সৌমেন নিয়োগী। বক্তৃতার পর আক্ষরিক অর্থেই প্রশ্নবান ছুটে আসে বক্তার দিকে। প্রতিবেশী দেশে যেমন ইতিমধ্যেই কয়েকবার সংবিধান সংশোধন হয়েছে, ভারত কি তার সংবিধান সূচনাপত্রের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারে না? সংবিধানে ধর্মের স্থান কী ছিল? কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রই বা কী ভূমিকা নিয়েছিল ইত্যাদি বহুমুখী মেধাবী জিজ্ঞাসায় প্রশ্নোত্তর পর যথার্থই হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত। অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক জয়ন্ত রায় ড. দেবদত্তা চক্রবর্তীর একটি গ্রন্থের উন্মোচন করেন। সে সময় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন পূর্বতন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক অসীম মিত্র। প্রয়াত ড. ধরের যোগ্য সহধর্মিণী ও সংস্থার প্রধান মহুয়া ধরের নীরব প্রচেষ্টাও অনুষ্ঠানটির সাফল্যের অন্যতম কারণ।

শ্রদ্ধা'র ৯৮তম শ্রদ্ধার্ঘ্য

গত ২১ মার্চ বীরভূম জেলার মল্লিকপুর অঞ্চলের বনবাসী গ্রাম ল-বাগানের সুমি হেমব্রমকে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করা হয় তাঁর বসতবাটিতে। ওঙ্কার ধ্বনি ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী লক্ষ্মণ হাঁসদা। সুমি হেমব্রমের নাতনি ও নাতবৌরা সাঁওতালি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সুমি হেমব্রমের পা ধুইয়ে পূজা করেন তাঁর নাতবৌ। তাঁকে মাল্যদান করেন 'শ্রদ্ধা'র শ্রীমতী কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। গীতা, বস্ত্র, উত্তরীয়, ফল ও মিষ্টান্ন দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শ্রদ্ধার পক্ষে বক্তব্য রাখেন উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক শান্তি কুমার মুখোপাধ্যায়। সাঁওতালি ভাষায় বক্তব্য রাখেন লক্ষ্মণ হাঁসদা। বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীকান্ত ঘোষ শ্রদ্ধার কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বেণীমাধব উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক পতিতপাবন বৈরাগ্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু।

সরস্বতী ট্রাস্ট এস্টেটের নতুন কমিটি

নদীয়া জেলার কল্যাণী ঘোষপাড়াস্থিত সরস্বতী ট্রাস্ট এস্টেটের নবগঠিত পাঁচ সদস্যের ট্রাস্টের সভাপতি মনোনীত হয়েছেন বিধাননগরের স্বয়ংসেবক তথা কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তা অর্জুন চন্দ। ২১ এপ্রিল সল্টলেকে অর্জুনবাবুর নিজস্ব কার্যালয়ে এক বিশেষ বৈঠকে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁকে এই পদে অভিষিক্ত করা হয়। এছাড়া এই ট্রাস্ট অদূর ভবিষ্যতে কী কী জনহিতকর কাজকর্ম করবে সে ব্যাপারেও এক খসড়া প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে স্থানীয় দুঃস্থ অসহায় মানুষের কল্যাণে বিভিন্ন স্বনির্ভর কর্মসূচি নেওয়া হবে। বৃদ্ধাবাস, অনাথ আশ্রম ও বিদ্যালয়কে সংস্কার করে নতুন আঙ্গিকে মেলে ধরা হবে। সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯ এপ্রিল এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ দুলাল চাঁদের প্রবর্তিত পুষ্পরথযাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে কয়েক হাজার ভক্ত সমাগম হয় মন্দির চত্বরে। প্রায় তিনশো বছর আগে আলোকসম্পন্ন সাধিকা সতীমার অনুপ্রেরণায় যে মন্দির ও পরবর্তীতে কর্তভজা বৈষ্ণবী সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল, তা আজ দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক।

সতীর পুণ্যে স্বামীর জীবন

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ধর্মরাজ যম। মৃত্যুর দেবতা। আবার আত্মজ্ঞানী— ব্রহ্মবিদ। মৃত্যুর পর সব প্রাণীই আসে তাঁর কাছে। তিনিই কর্মফল অনুযায়ী নির্দিষ্ট করে দেন মৃত প্রাণীর স্থান— স্বর্গ অথবা নরক।

মৃত্যুতেই সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর সঙ্গে। তবে সশরীরে যমলোকে গিয়ে তাঁর দেখা পান রাজা বাজশ্রবার পুত্র নচিকেতা। লাভ করেন আত্মতত্ত্ব— ব্রহ্মজ্ঞান।

সশরীরেই যমকে অনুসরণ করেছিলেন রাজা অশ্বপতি-নন্দিনী, শাল্বরাজ সত্যবান-জায়া সাবিত্রী। আপন নিষ্ঠা, মেধা ও প্রজ্ঞায় তিনি যমের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনেন মৃত পতি সত্যবানকে। সেই সঙ্গে লাভ করেন ব্রহ্মবিদ্যাও।

সে এক বিচিত্র কাহিনি।

মদ্ররাজ অশ্বপতি। স্ত্রী মালবী। শৌর্যবীর্যে, সততায় ধর্মাচরণে তুলনাহীন তিনি। অভাব নেই কোনও কিছুরই। এত থাকার মধ্যেও একটাই অভাব, একটাই না-পাওয়ার যন্ত্রণা—নিঃসন্তান তিনি।

অবশেষে সন্তান পাওয়ার জন্য শুরু করলেন এক যজ্ঞ— সাবিত্রী যজ্ঞ। আঠারো বছর ধরে চলে সাধনা। অবশেষে সেই যজ্ঞে আবির্ভূতা হলেন স্বয়ং বেদমাতা— সাবিত্রী। বর দিলেন, রাজা হবেন দুই সন্তানের পিতা। একটি কন্যা ও একটি পুত্র।

বর দিয়ে বেদমাতা সাবিত্রীই জন্ম নেন রাজার কন্যা রূপে। সাবিত্রীর আরাধনায় কন্যা, তাই রাজা তাঁর নাম রাখেন সাবিত্রী।

পরম্পরা

অপরূপা সাবিত্রী। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রূপের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে থাকে ভুবন। শুধু রূপ নয়, নানা গুণের অধিকারিণী সাবিত্রী। এহেন কন্যারও কিন্তু উপযুক্ত পাত্র জোটে না।

বয়স বাড়ে। চিন্তিত রাজা। অবশেষে পাত্র নির্বাচনের জন্য রাজা অশ্বপতি মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েন দেশ পরিক্রমায়। সঙ্গে কয়েকজন ধীমান বৃদ্ধ মন্ত্রী। সেই পরিক্রমা কালেই তাঁরা আসেন এক তপোবনে মুনিদের আশ্রমে। সেখানেই বাস করছিলেন তখন শাল্বদেশের বৃদ্ধ ও বিতাড়িত রাজা দ্যুমৎসেন সপরিবারে।

রাজা দ্যুমৎসেন ভাগ্যের পরিহাসেই বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারান। তারই সুযোগ নিয়ে শত্রুরা দখল করে তাঁর রাজ্য। নিয়তি-তাড়িত রাজা স্ত্রী ও পুত্র সত্যবানকে নিয়ে হন তপোবনবাসী।

সেই তপোবনে বিচরণের সময়ই সাবিত্রী দেখেন সত্যবানকে। দেখেই মুগ্ধ কন্যা মনে মনে তাঁকেই বরণ করেন পতি হিসেবে। ফিরে সব কিছু জানান তিনি পিতা অশ্বপতিকে।

ওই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন দেবর্ষি নারদ। সাবিত্রীর কথা শুনে বলেন তিনি, সত্যিই সত্যবানের মতো ছেলে হয় না। নানা গুণের অধিকারী সত্যবান অত্যন্ত মাতৃ-পিতৃভক্ত। তাঁদের সেবাতেই সদা ব্যাপৃত। আত্মসুখ নয়, মাতা-পিতার পরিচর্যাতেই কাটে তাঁর দিন। তবে—!

থেমে যান নারদ। আর তাতেই উৎকণ্ঠিত পিতা অশ্বপতির জিজ্ঞাসা, তবে কী দেবর্ষি।

সে বড়ো খারাপ কথা। সে কথা তোমার না-শোনাই ভালো। তুমি বরং অন্য পাত্র দেখ।

সাবিত্রী কিন্তু বলে ওঠেন, মনে মনে সত্যবানকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছি। তাই অন্য কাউকে বিয়ে করা সম্ভব নয়। দ্বিচারিণী হতে পারব না কিছুতেই।

এবার সংকটে পড়েন রাজা। একদিকে কন্যা সাবিত্রীর দৃঢ়তা ও জেদ, অন্যদিকে দেবর্ষির অকথিত অশুভ এক ইঙ্গিত— দুয়ের টানা পোড়েনে দিশেহারা রাজা এবার জানতে চান সত্যবান সম্পর্কে খারাপ খবরটি।

নারদ বলেন, সত্যবান সবদিক থেকেই সাবিত্রীর উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু বড়োই স্বপ্নায়ু সে। আর মাত্র একবছর তার পরমায়ু।

বিচলিত পিতা। একথা শোনার পর সত্যবানের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান না তিনি। কিন্তু সাবিত্রী জানান, তিনি বিয়ে করবেন সত্যবানকেই। তাতে যা হওয়ার তাই হোক।

কন্যার জেদের কাছে হার মানেন পিতা। সত্যবানের সঙ্গেই বিয়ে হয় সাবিত্রীর। বিয়ের পর সাবিত্রী চলে আসেন বনে স্বামী ও শ্বশুরের কাছে। তাঁদের সেবাতেই দিন কাটে তাঁর। সত্যবানের পরমায়ু যে মাত্রই একটি বছর— একথা জানান না কাউকে, নিজে শুধু দিন গোনেন। সেইসঙ্গে মনে মনে ডাকতে থাকেন ঈশ্বরকে।

ঘনিয়ে আসে সত্যবানের শেষের সেই

দিন। তার আগে পরপর তিন দিন উপবাস করেন সাবিত্রী। চতুর্থ দিনে উপবাস ভঙ্গ করলেও আহার করেন না কিছুই। বরং অগ্নিতে আহুতি দেন সব কিছু। সাবিত্রীর ওই কঠোর ব্রত সাধনায় প্রীত সকলেই তাঁকে অবৈধব্যর আশীর্বাদ করেন। সেইসঙ্গে তাঁকে আহার করতেও বলেন। সাবিত্রী জানান, সূর্যাস্তের পর তিনি খাবেন।

ওদিকে সত্যবান প্রতিদিনের মতোই কাঠ কাটার জন্য বনে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। বাবা-মা-কে প্রণাম করে পা বাড়ান তিনি। হঠাৎই সাবিত্রী বলেন, তিনিও যাবেন সঙ্গে। সত্যবান নানা ভাবে তাঁকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্বশুর-শাশুড়ির অনুমতি নিয়ে সত্যবান-সঙ্গিনী হন সাবিত্রী।

বনে কাঠ কাটার সময় এল চরম মুহূর্ত। সাবিত্রীর কোলে মাথা রেখে মারা যায় সত্যবান। আসেন যমরাজ। সাবিত্রীর প্রশ্নের উত্তরে আত্মপরিচয় দিয়ে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণপুরুষ সত্যবানকে নিয়ে যেতে থাকেন দক্ষিণদিকে। অনুগামী সাবিত্রীও।

সাবিত্রীকে আসতে দেখে অবাক যম। বলেন, বৃথা অনুসরণ। জীবিতের নেই তাঁর সঙ্গে যাওয়ার অধিকার। সাবিত্রী জানান, স্বামীকে অনুসরণই স্ত্রীর একমাত্র কর্তব্য। যম নানাভাবে সাবিত্রীকে নিরস্ত করতে না পেরে স্বামীর জীবন ছাড়া যে-কোনও বর দিতে চান। সাবিত্রী শাস্ত্রের উল্লেখ করেই একে একে চারটি বর পান। প্রথম বরে শ্বশুরের দৃষ্টিশক্তি লাভ, দ্বিতীয় বরে রাজ্য, তৃতীয় বরে পিতার উত্তরাধিকারী পুত্র এবং চতুর্থ বরে চান সত্যবানের ঔরসে শত পুত্রের জননী হতে।

সাবিত্রীর মনোবল ও বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ যম। না-বুঝে অথবা বুঝেই সে বরও দেন তিনি। সত্যবানের জীবনদান ছাড়া যে তাঁর বর কার্যকর হবে না তা বুঝতে পারেন এবার যম। তাই ফিরিয়ে দেন সত্যবানের জীবন। দেন চারশো বছর পরমায়ু। এ কাহিনি মহাভারতের।

দেবী ভাগবতে আছে, ধর্মরাজ সেদিন সাবিত্রীকে শোনান আত্মতত্ত্বের কথাও। যমের হাত থেকে সত্যবানকে ফিরিয়ে আনেন সাবিত্রী জৈষ্ঠ্যের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে। একারণেই দিনটি পরিচিত সাবিত্রী চতুর্দশী নামে। অগ্নিপুরাণে আছে, — পঞ্চদশ্যাংব্রতী জ্যৈষ্ঠে বটমূলে মহাসতীম্— জ্যৈষ্ঠের পঞ্চদশীতে বটমূলে মহাসতী সাবিত্রীর পুজো করতে হয়।

এই ব্রত সম্পর্কে বলা হয় জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দশীতে উপবাসী থেকে যেসব স্ত্রী বটগাছের গোড়ায় সাবিত্রীর অর্চনা করেন তাঁরা কখনও বিধবা হন না।

সাবিত্রী চতুর্দশী একটি পৌরাণিক ব্রত। এই ব্রতে ষোড়শোপচারে সাবিত্রীর পুজো করতে হয়। ধ্যানমন্ত্রে বলা হয়েছে, 'সাবিত্রী দ্বিভুজাং পদ্মাসনস্থাং হংসবাহনাম্। শুদ্ধস্ফটকসঙ্কাশাং দিব্যাভরণভূষিতাম্।। পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠীথত পূর্ণচন্দ্র নিভাননাম্। ললাটতিলকো পেতাং মধ্যষ্ঠীণামহং ভজে।। এই ধ্যানমন্ত্র থেকে বোঝা যায়, সত্যবান-জায়া সাবিত্রী আর বেদমাতা সাবিত্রী অভিন্ন।

সাবিত্রী চতুর্দশীব্রতে মহাসতীর আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মরাজ যমেরও অর্চনা করা হয়। সেইসঙ্গে অশ্বপতি, দ্যুমৎসেন, শৈব্যা, মালবী প্রমুখেরও পুজো করা হয়।

এক সময় বাংলার ঘরে ঘরে সাবিত্রী চতুর্দশীর ব্রত পালন করা হতো। এখনও পল্লীবাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ব্রত পালন করেন সধবা মহিলারা পরম নিষ্ঠায়। কোনও কোনও জায়গায় এই দিন একই সঙ্গে হল বা লাঙ্গলেরও পুজো করা হয়। বোঝা যায়, কৃষিপ্রধান বাংলায় সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত একইসঙ্গে বৈধব্যর হাত থেকে মুক্তি এবং সুফলন বা সুপ্রজননের জন্য পালন করা হয়ে থাকে। ■

অখণ্ড ভারতের রূপকার

আদি শঙ্করাচার্য

ডাঃ সমীর কুমার চট্টোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে ধর্ম নিষিক্ত। তার সনাতন ইতিহাস আধ্যাত্মিক ফল্গুধারার স্রোত। কার্যত অধ্যাত্মবাদ ও ধর্মই ভারতের আদি ও চিরন্তন নিয়ন্ত্রক। প্রাত্যহিক ক্রিয়া, আনুষ্ঠানিক আচার আচরণ, ধ্যানধারণা সংস্কৃতি, জন্মের পূর্ব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ভারতীয় জীবন ধারায় অধ্যাত্মবাদ তথা ধর্মের অপরিসীম প্রভাব লক্ষণীয়। ১২০০ বছর আগে আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব সনাতন হিন্দু ধর্মকে সার্বিক পতন থেকে রক্ষা করে এবং ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর ঐশী সত্ত্বায় জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের অপরূপ ত্রিবেণী সঙ্গম রচিত হয়েছিল। কী বেদ, কী ভগবদগীতা, কী বেদান্ত দর্শন— সর্বত্র ছিল তাঁর অপ্রতিহত গতি, অবাধ বিচরণ। যা একবিংশ শতাব্দীর মানুষের মধ্যেও গভীর বিস্ময় সৃষ্টি করে চলেছে। তাই আদি শঙ্করাচার্যকে সনাতন হিন্দু সমাজ স্বীকার করে নিয়ে

নিয়েছে ভগবান শঙ্করের অবতার রূপে।

বিশ্বররেণ্য এই অবতার পুরুষের আবির্ভাব ঘটে কেরলের কালাডি গ্রামে। পিতা শিবগুরু ও মাতা আর্যাম্বা। মাত্র আট বছরে সমস্ত শাস্ত্রে তিনি অসামান্য পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর অপরূপ শাস্ত্র ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হতেন সমগ্র গ্রামবাসী। একদিন নদীতে স্নানকালে বালক শঙ্কর কুমিরের মুখে পড়েন। কুমিরটি তাঁর পা কামড়ে ধরে। তাঁর আর্ত চিৎকারে গ্রামবাসীরা নদীতীরে চলে আসে এবং অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে কুমির কবলিত শঙ্করের দিকে। কিন্তু অকুতোভয় শঙ্কর ক্রন্দনরতা মাকে বলেন, 'মা তুমি আমায় সন্ন্যাসের অনুমতি দিলে কুমির আমায় মুক্তি দেবে, নয়তো মৃত্যু অনিবার্য।' উপায় বিহীনা আর্যাম্বা শঙ্করকে অনুমতি দিলেন সন্ন্যাসের। কিন্তু সে সময় কোনও ধর্মগুরু, পণ্ডিত বা সাধক শঙ্করকে আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস ও দীক্ষা দিতে রাজি হলেন না। উপরন্তু শুরু করলেন তাঁর ব্যাপক সমালোচনা। অনিবার্যভাবে শঙ্কর গ্রাম ত্যাগ করলেন এবং বহু পথ অতিক্রম করে নর্মদার তীর ধরে এগিয়ে চললেন। নর্মদার তীরে ওঙ্কারেশ্বরে এক গিরিগুহায় তিনি দর্শন পেলেন তাঁর আদিষ্ট গুরু মহাযোগী গোবিন্দপাদের।

তীব্র সাধনায় তিনি হন আপ্তকাম। শুরু হয় তাঁর কর্মযজ্ঞ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করেন এবং অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাও প্রচার করেন। অত্যন্ত দক্ষতা ও ঐশী প্রতিভার সাহায্যে হিন্দু ধর্মের উপর সমস্ত আক্রমণ ও অপপ্রচারের মোকাবিলা করেন। শঙ্করই সুপ্রাচীন 'স্বামী' নামক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করে দেশের চারপ্রান্তে চারটি বিখ্যাত মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে মঠ স্থাপনের পশ্চাতে ছিল এক ঐক্যবদ্ধ ও অখণ্ড ভারতের রূপকল্পনা। নানা ধারণা মত ও গোষ্ঠী এবং নানা সম্প্রদায়ের বসবাস হলেও আমরা একই পরিবারভুক্ত, সমগোত্রীয়। আমাদের সকলের ভাগ্য এক এবং তা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। তিনি নিছক এক ধর্মপ্রবক্তা নন। সর্বধর্মের মধ্যে যে এক ও অন্তর্নিহিত সত্য আছে, তাকেই তিনি প্রচারের প্রতিপাদ্য বিষয় করেছেন। তাঁর আবেদন ছিল, বিশ্বজনীন। প্রায় ১২০০ বছর আগে তিনি যে মঠ স্থাপন করেছিলেন, তা আজও সমানভাবে সক্রিয়। এই মঠগুলির অধ্যক্ষবৃন্দ ভাববাদী পরম্পরায় 'জগদগুরু শঙ্করাচার্য' উপাধি ধারণ করে থাকেন। চার মঠ ছাড়া আরও একটি মঠ আছে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমে, যা কাঞ্চিমঠ নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, আদি শঙ্কর তাঁর বাসস্থানের জন্য এই মঠের পত্তন করেছিলেন। যদিও এ নিয়ে বিতর্ক আছে।

মঠগুলির মধ্যে আদি শঙ্করের জীবনে কাঞ্চিমঠের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। কারণ কাঞ্চিপুরমস্থ কাঞ্চিমঠের আরাধ্য দেবী হলেন ভগবতী রাজ রাজেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী আদতে ছিলেন শঙ্করের ইষ্টদেবী। যদিও দশ মহাবিদ্যায় দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর স্থান তৃতীয়, তবুও ত্রি অর্থাৎ তিন, পর অর্থে পুরাতন, সুন্দরী। অর্থাৎ কালী, তারা ও ত্রিপুরা এই তিন সুন্দরীর মধ্যে তিনি প্রাচীন। মতান্তরে ইনি হলেন মহালক্ষ্মী, নামান্তরে কোথাও কামাক্ষী, মীনাক্ষী, কন্যাকুমারী, মধুরাকালী, হংসেশ্বরী ইত্যাদি। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্ত্রের নাম হলো 'শ্রী-যন্ত্র'। সাধক কুলের কাছে এই মন্ত্রের সাধনা হলো শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক সাধনা। শ্রীযন্ত্রের সাধনার ফলে সাধকের লাভ হয় ধর্ম-অর্থ-কাম- মোক্ষ এই চর্তুবর্গ।

শঙ্কর কাঞ্চিপুরমে কামাক্ষী দেবী মন্দিরে তাঁর এই ইষ্টদেবীর দর্শন লাভ করেন এবং মায়ের আদেশে শ্রীযন্ত্রের পূজা প্রচলন করেন। মায়ের দর্শন লাভে মোহিত হয়ে তিনি আবৃত্তি করেন জগদ্বিখ্যাত সৌন্দর্যলহরী স্তোত্র। কথিত যে এই স্তোত্র স্বয়ং দেবাদিদেব মহেশ্বর কৈলাসে শঙ্করকে দিয়েছিলেন।

শঙ্কর পরিক্রমাকালে কোনও দেবতার মন্দিরে উপস্থিত হলে প্রণাম করতেন না বিগ্রহকে। কেবল হস্তধৃত দণ্ড দ্বারা দেবতার ফলককে স্পর্শ করতেন। কিন্তু দেবী মন্দিরে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সাষ্টাঙ্গে দেবীকে প্রণাম করে 'শ্রী-যন্ত্র' স্থাপন করে নব আবরণের পূজা করতেন। যুক্তি ছিল তাঁর, শক্তি ব্যতীত শিব অচল। শিব শব্দ থেকে 'ই'কে যদি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে শবে পরিণত হয় তা। 'ই' শক্তির প্রতীক। তাই সমস্ত দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করে তিনি পঞ্চায়তন পূজার নির্দেশ দিলেন। কোনও কোনও মতে ষষ্ঠায়তন পূজা। শক্তম (শক্তি), শৈবম (শিব), বৈষ্ণব (বিষ্ণু), সূর্যনারায়ণ (সৌর), গাণপত্য (গণপতি) প্রভৃতি পঞ্চ উপাসনা পদ্ধতিকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ষষ্ঠ আরাধনা হলো সুব্রহ্মণ্য বা কুমার কার্তিকের আরাধনা।

আজীবন মাতৃভক্ত শঙ্কর বিশ্বাস করতেন লৌকিক পিতা-মাতার ভক্তি ও সেবা থেকেই সমস্ত সেবার সূত্রপাত এবং অচলা গুরু সমর্পণে তার সমাপ্তি। সুতরাং মাতা-পিতাকে ব্যতীত কোনও ভক্তি, সেবা বা অর্চনা দেবতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্কারে তিনি যে অসাধারণ মননশীলতার পরিচয় দিয়েছেন তা অতুলনীয়। ধর্মের অপ্রয়োজনীয়, অবাস্তব, স্থূল খোলসকে ভেঙে ধর্মের সারবস্তুকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন পাদপ্রদীপের আলোয়। ফলে তাঁর দর্শনে একটা সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণতা গড়ে উঠেছে। যা আজও রয়েছে অবিকৃত, অম্লান তাঁর প্রয়াণের বারশো বছর পরেও।

(আদি শঙ্করাচার্যের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রকাশিত)

গল্প

সিলভার জুবিলি

সুমন্ত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

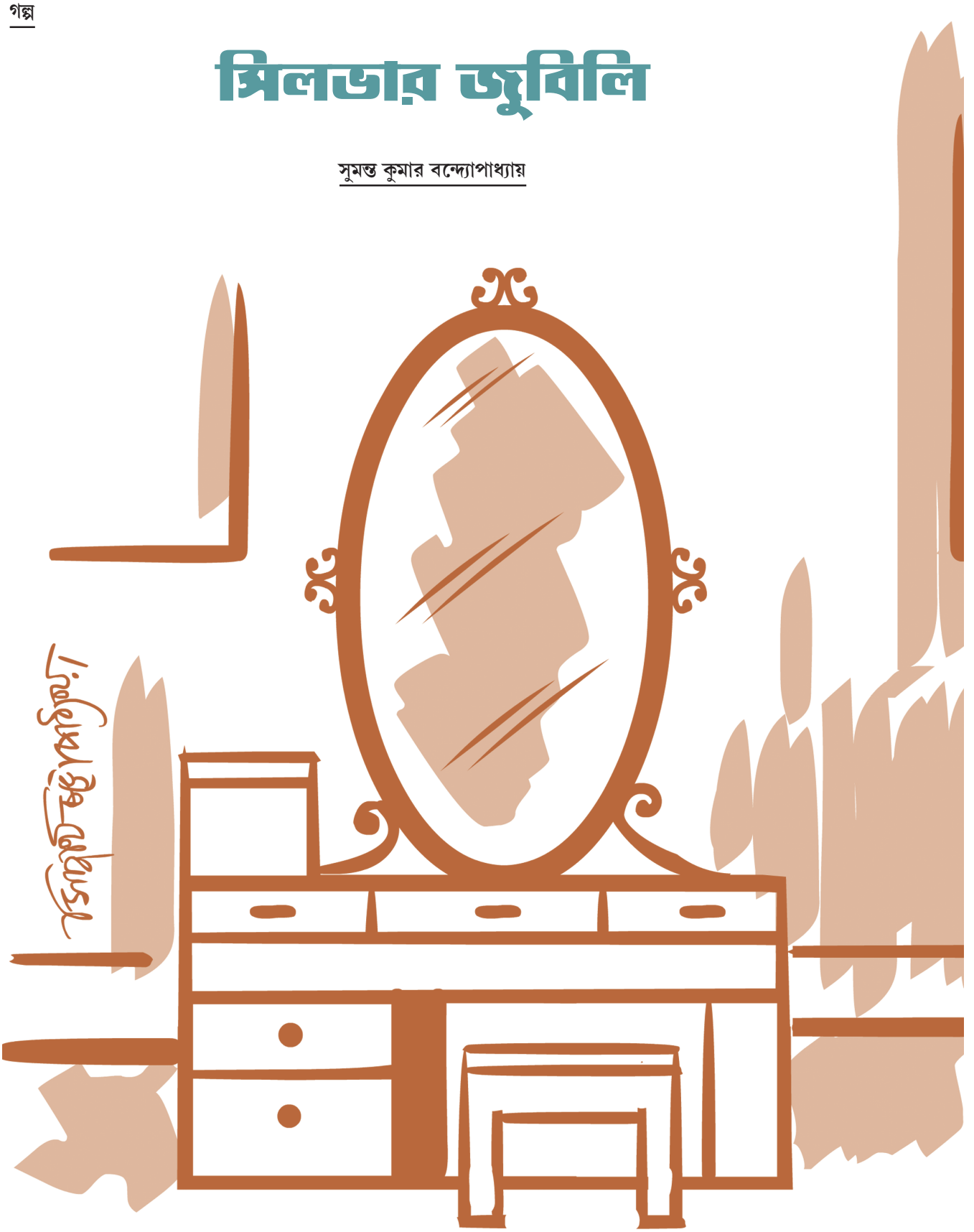

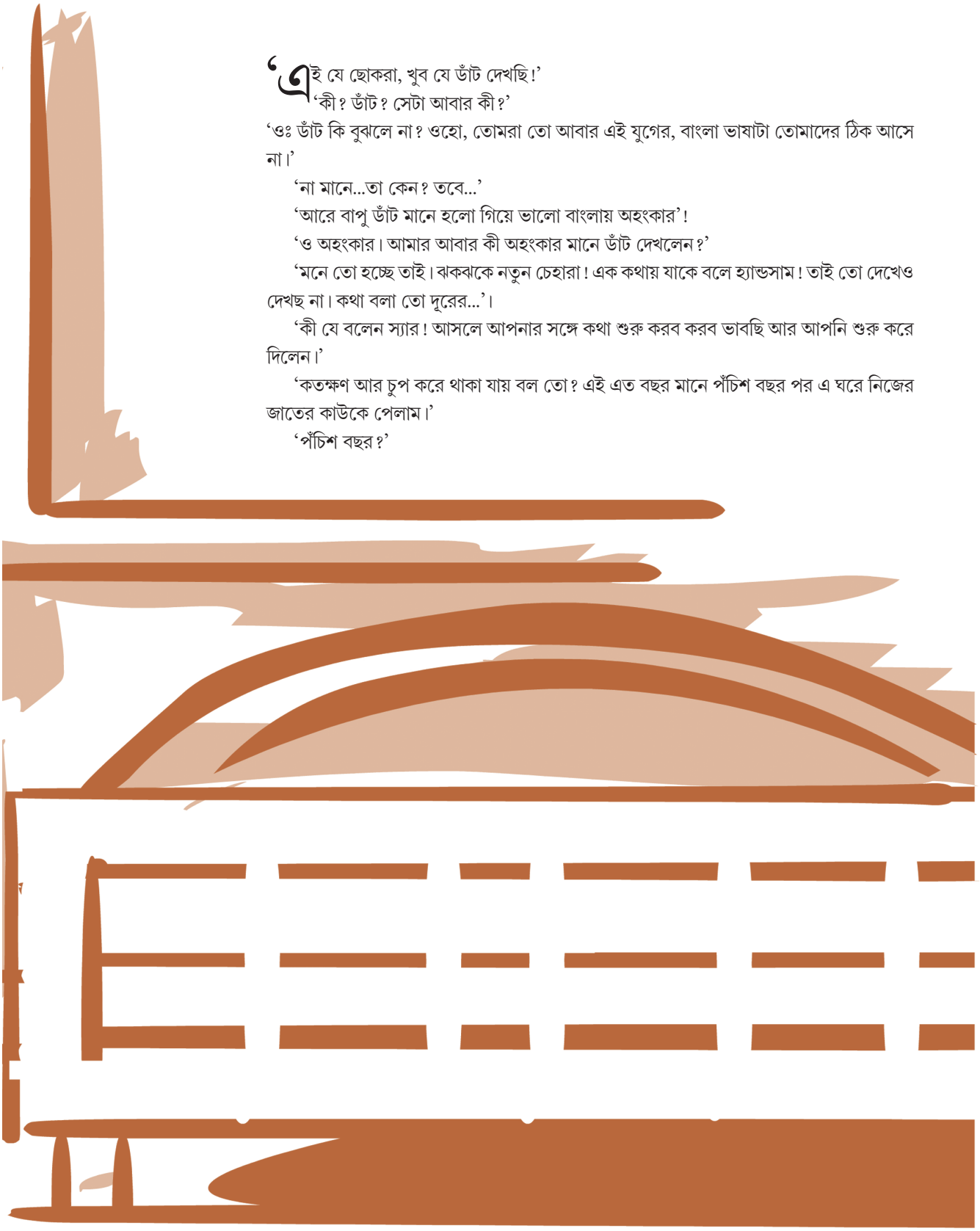

‘এই যে ছোকরা, খুব যে ডাঁট দেখছি!’

‘কী? ডাঁট? সেটা আবার কী?’

‘ওঃ ডাঁট কি বুঝলে না? ওহো, তোমরা তো আবার এই যুগের, বাংলা ভাষাটা তোমাদের ঠিক আসে না।’

‘না মানে...তা কেন? তবে...’

‘আরে বাপু ডাঁট মানে হলো গিয়ে ভালো বাংলায় অহংকার’!

‘ও অহংকার। আমার আবার কী অহংকার মানে ডাঁট দেখলেন?’

‘মনে তো হচ্ছে তাই। ঝকঝকে নতুন চেহারা! এক কথায় যাকে বলে হ্যান্ডসাম! তাই তো দেখেও দেখছ না। কথা বলা তো দূরের...’।

‘কী যে বলেন স্যার! আসলে আপনার সঙ্গে কথা শুরু করব করব ভাবছি আর আপনি শুরু করে দিলেন।’

‘কতক্ষণ আর চুপ করে থাকা যায় বল তো? এই এত বছর মানে পঁচিশ বছর পর এ ঘরে নিজের জাতের কাউকে পেলাম।’

‘পঁচিশ বছর?’

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

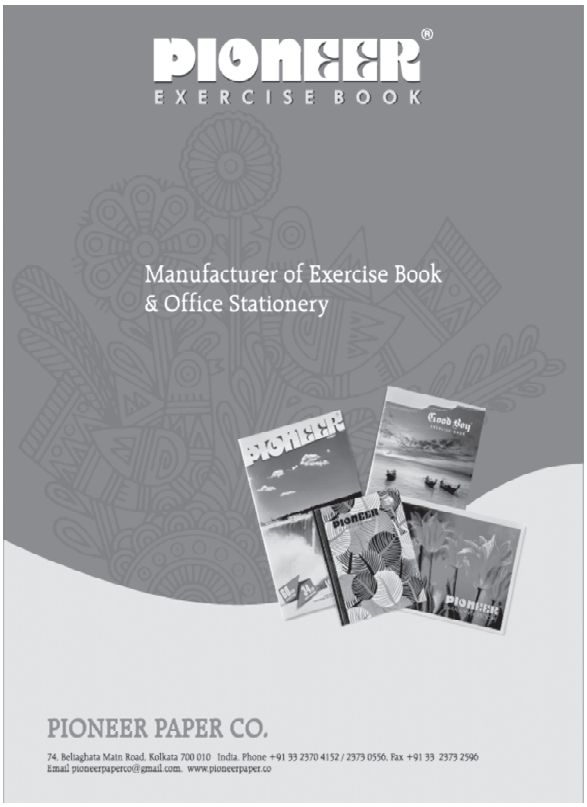

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

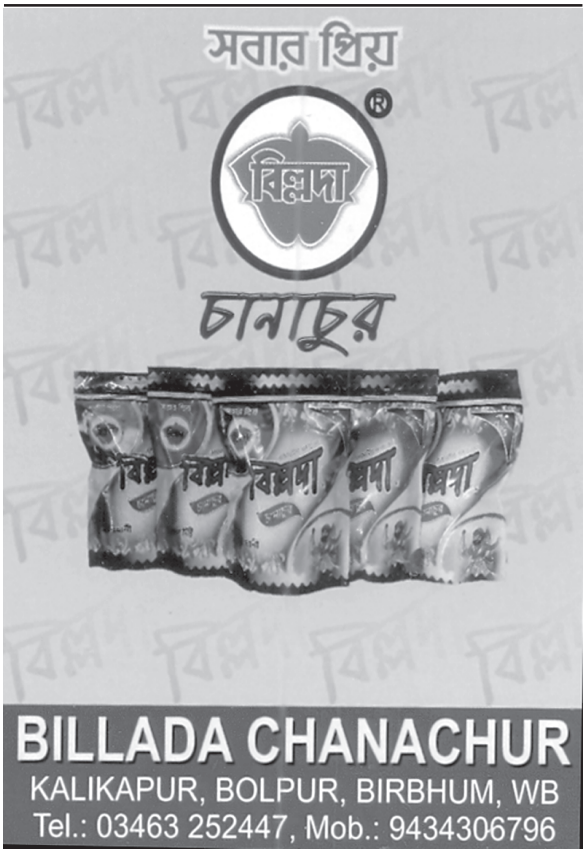

'হ্যাঁ, তাই তো'।

'বাব্বা! বলেন কী? তা এই পঁচিশ বছর কাটালেন কীভাবে? সময় কাটত কী করে আপনার?'

'এই খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল— এদের সঙ্গে গল্প করে। ওদের সঙ্গেই যত সুখ-দুঃখের কথা বলে...।'

'আপনারা সবাই একসঙ্গে এ ঘরে এসেছিলেন?'

'খাট-আলমারি আর আমি বৌদিমণির সঙ্গেই এসেছিলাম। আর চেয়ার-টেবিলকে দাদাবাবু বিয়ের বছর তিনেক পরে নিয়ে এসেছিল। তবে বৌদিমণির সত্যিকারের বন্ধু ছিলাম আমিই।'

'তাই নাকি? তা চেয়ার-টেবিলরা গেল কোথায়? দেখছি না তো?'

'আরে দাদাবাবু নিজের কাজের জন্যে তো কিনে এনেছিল। তারপর বৌদিমণি ছেলেকে পড়াতো ওই চেয়ার-টেবিলে, বছর দুয়েক আগে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে ছেলে বাইরে চলে গেল আর দাদাবাবুর ঘাড়ে স্পন্ডেলাইটিস ধরা পড়ল। চেয়ার-টেবিল আর কে ইউজ করবে? তাই ওদের বিদায় করে দিল।'

'একেবারে বিদায় করে দিল?'

'হ্যাঁরে ভাই, এ সংসারে প্রয়োজন ফুরোলে মানুষকেই বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে আর চেয়ার টেবিল?'

'কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না দাদা, তোমার বৌদিমণির যখন বিয়ে হলো তখন তো তোমায় ড্রেসিং টেবিলে করে আনতে পারত, তাহলে তো তোমার প্রেস্টিজ অনেক বেশি...।'

'সে বৌদিমণির বাবা যদি পারতেন..., তাহলে কী আর আমাকে শুধু এই ভাবে পাঠাতেন?'

'ওকে, ওকে বুঝেছি।'

'কিছুই বোঝোনি ভায়া। এই আমাকে শুধু একলা পাঠিয়ে ছিল বলে প্রায়ই তো দাদাবাবু বৌদিমণিকে কথা শোনাতো। এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি কম হয়েছে নাকি?'

'কী বলছেন দাদা! এই সামান্য একটা জিনিস নিয়ে...'

'হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ। সংসারে সামান্য জিনিস নিয়েই তো অসামান্য ঝগড়াঝাটি হয়।'

'আচ্ছা! তাই নাকি?'

'বটেই তো, সবে সংসারে এসেছো; আস্তে আস্তে সব বুঝবে। কত কী দেখবে, জানবে। তবে বাপু যাই বলো, আগেকার ড্রেসিং টেবিলদের ভারী সুন্দর বাহার ছিল। কী চমৎকার কাঠের কাজ! যাই বলো নতুন বরকনের ঘর ড্রেসিং টেবিল ছাড়া ভাবা যেত? নতুন বৌ ঘুরবে ফিরবে, বারবার এসে দাঁড়াবে। তখন তো জয়েন্ট ফ্যামিলিতে নতুন বর যত না নতুন বৌকে কাছে পেত, ড্রেসিং টেবিল তার থেকে বেশি কাছে পেত নতুন বৌকে।'

'হ্যাঁ তখন মানুষের হাতে সময়ও ছিল এনাফ।'

'শুধু সময় নয়, মানসিকতাও ছিল, বুঝলে? সৌন্দর্যকে উপভোগ করার, মর্যাদা দেবার। সে যুগে যে-কোনও মেয়ের বা বৌয়ের ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গে একটা ছবি অন্তত আছেই আছে।'

'আচ্ছা? বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছে কিন্তু আমার। হেবি রোমান্টিক ব্যাপার-স্যাপার তো!'

'দেখো কাণ্ড! তুমি এ যুগের ছেলে হয়েও রোমান্সটা কিন্তু ঠিক ধরে ফেলেছো। গুড গুড। আরে তোমায় বলব কী ভাই, একটা মেয়ে একেবারে অচেনা-অজানা একটা ফ্যামিলিতে এসে পড়ল। কত কথা, কত সমালোচনা, নিন্দেমন্দ শুনতে হয় তাদের। কত দুঃখ-কষ্ট!'

'বুঝেছি, আর সেগুলো শেয়ার করত ওই ড্রেসিং টেবিলের সঙ্গে।ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটাই ছিল বেস্ট ফ্রেন্ড। রাইট?

'একেবারে ঠিক বলেছো ভায়া। কত নির্জন দুপুরে ঘরের দরজা বন্ধ করে মেয়েটার কত সহস্র মিনিট ঘণ্টা কেটে গেছে ওর সঙ্গে।'

'তার মানে ড্রেসিং টেবিল মানে আয়নাটা কত কিছু শুনেছে, দেখেছে...।'

'তা নয় তো কী? স্বামীকে দেখানোর আগে সে বেনারসি গয়নায় সুসজ্জিতা হয়েই বলো আর সম্পূর্ণ নিরাবরণ নিরাভরণ অবস্থাতেই বলো, আয়নাকে দেখিয়ে সার্টিফিকেট নিয়ে তবেই শান্তি!'

'ইস, খুব মজা ছিল বলুন।'

'তা তো ছিলই। কেউ কেউ অবশ্য আয়নার ওপর সুন্দর হাতের কাজের ঢাকা দিয়ে দিত। তাতে রোমান্সের দৃশ্যগুলো দেখতে একটু অসুবিধা হতো বৈকি; তবে যা দেখতে পেত তাই বা কম কী? ভাবো না একবার; ফুলশয্যার রাতে বাড়ি সুদ্ধু লোকের চোখে ঘুম নেই। সমবয়সী ভাই বোন বন্ধু বান্ধবদের ঘরের বাইরে অস্থির অবস্থা, নানান ফন্দি ফিকির মাথায়। আর ঘরের ভেতরে দুটি মানুষের দেওয়া নেওয়ার সাক্ষী শুধুমাত্র ওই একজনই।'

'তাহলে তুমিও কাকা সব কিছু দেখেছো?'

'তা আর হলো কই? আমার তো হাফ সাইজ। মাথা থেকে আড়াই ফুট অব্দি আমার দৌড়।'

'ওহো, তাই তো। আচ্ছা একটা কথা, এই মাঝ বয়েসে এসে আমাকে কেন এ ঘরে এনে ঢোকালেন দাদাবাবু? এখন তো আপনার দাদা-বৌদির ফর্ম পড়তির দিকে...।'

'ওইখানেই মারাত্মক ভুল করলে ব্রাদার। এই পঞ্চাশ বাহান্ন থেকেই আবার নতুন করে জেগে ওঠে প্রেম, আবার নতুন করে একে অপরকে চিনতে শুরু করে!'

'মানে লাইফের একটা নতুন চ্যাপ্টার, একটা নতুন জার্নি শুরু হয় বলছেন?'

'কারেক্ট! আর সেই জন্যেই তো এই নতুন জীবনের সাক্ষী রাখার জন্য তোমার মতো একজন নিউ জেনারেশনের নিউ মডেলকে গিফট্ করল দাদাবাবু বৌদিমণিকে 'সিলভার জুবিলি' ম্যারেজ অ্যানিভারসারিতে।'

'তবে আমি তো ঠিক ড্রেসিং-টেবিল নই, ড্রেসিং কেস বলতে পারেন, তবে আমি স্পেস সেভিং।'

'তুমি শুধু স্পেস সেভিং কেন, পকেট সেভিংও বটে। ভালো কাঠের যা দাম ছিল!'

'আচ্ছা! তাই নাকি? আপনি তো জানবেনই, চলুন, আমরা দুজনে ওঁদের নতুন জীবনের সঙ্গী হই, আর সাক্ষী থাকি।'

'ঠিক হ্যায়, তবে এখন থেকে আমি পিছনে ভাই। তুমিই সামনে থেকো। তোমাকেই মানাবে।' ■

উপনয়নের হিরো

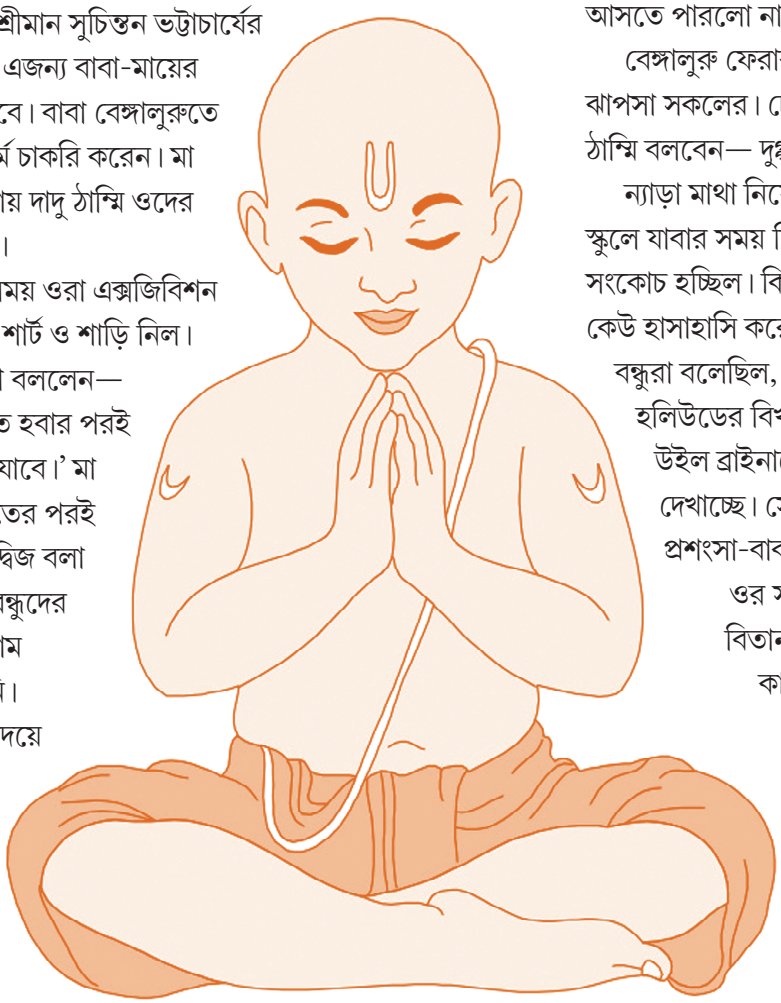

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান সুচিন্তন ভট্টাচার্যের শিগগিরই পৈতে হবে। এজন্য বাবা-মায়ের সঙ্গে সে কলকাতায় যাবে। বাবা বেঙ্গালুরুতে একটা কম্পিউটার ফার্মে চাকরি করেন। মা স্কুল শিক্ষিকা। কলকাতায় দাদু ঠাম্মি ওদের পথ চেয়ে বসে আছেন।

কলকাতায় যাবার সময় ওরা এক্সজিবিশন থেকে দাদু ঠাম্মির জন্য শার্ট ও শাড়ি নিল। ট্রেনে যেতে যেতে বাবা বললেন— 'চিনু মনে রেখো, পৈতে হবার পরই তুমি পুরো বাহ্মণ হয়ে যাবে।' মা হেসে বললেন— 'পৈতের পরই তো দ্বিতীয় জন্ম। তাই দ্বিজ বলা হয়।' সুচিন্তন বাঙালি বন্ধুদের কাছে শুনেছে— এর নাম সেক্রেড থ্রেড সেরিমনি।

বাড়ি পৌঁছে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে নিল সুচিন্তনরা। দাদু বললেন -- বল দেখি চিনু পৈতের ভালোকথা কী? পারলি না তো। তা হলো উপনয়ন, আর পৈতের পবিত্র সুতোর ভালোকথা হলো উপবীত।

উপনয়নের দিন সবাই ব্যস্ত। পুরোহিত নারায়ণ পুজো করলেন। পৈতে পরালেন। একদিনেই এখন দণ্ডী বিসর্জন হয়। তাই খাওয়া- দাওয়াতেও এখন আর বিধিনিষেধ থাকে না। চিনু অর্থাৎ সুচিন্তন ভাবলো ঠাম্মি তো আগেই বলেছিলেন তাকে ন্যাড়া মাথা হতে হবে। চৈতন্যদেবের মতো দেখাবে।

সন্ধেবেলা প্রীতিভোজের জন্য নিমন্ত্রিতরা এল। সকলেই বললো, তুমিই তো আজকের হিরো। বাবা আত্মীয়দের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন আর চিনু তাঁদের প্রণাম করছে। তাঁরা চিনুর হাতে উপহার সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন। চিনুর একটু খারাপ লাগছে ভেবে যে, তার স্কুলের বন্ধুরা কেউ এই আনন্দ অনুষ্ঠানে আসতে পারলো না।

বেঙ্গালুরু ফেরার দিন চোখ ঝাপসা সকলের। চোখের জল চেপে ঠাম্মি বলবেন— দুগ্গা দুগ্গা।

ন্যাড়া মাথা নিয়ে প্রথম দিন স্কুলে যাবার সময় চিনুর একটু সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু স্কুলের বন্ধুরা কেউ হাসাহাসি করেনি। উঁচু ক্লাসের বন্ধুরা বলেছিল, তাকে নাকি হলিউডের বিখ্যাত অভিনেতা উইল ব্রাইনারের মতো দেখাচ্ছে। সেটা তো প্রশংসা-বাক্যই।

ওর সহপাঠী বাঙালি বিতান চ্যাটার্জি ওর কাছে উপনয়নের গল্প শুনে খুবই উৎসাহিত। কিন্তু তার মা-বাবা এসব পুরোন রিচুয়ালস-এর জন্য কলকাতায় যেতে রাজি নন। তাই ওর মন খারাপ। সুচিন্তন ভাবে তাদের টিচার তো শেখান—'য়ু মাস্ট বি ট্রু টু ইয়োর অরিজিন। অতীতের শেকড়, আচার অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে কেউ কখনও বড়ো হতে পারে না।' আচ্ছা, এসব কথা কি এমনি করে বড়োদের শেখানো যায় না?

রূপশ্রী দত্ত

ভারতের পথে পথে

শিবসাগর

অহোম রাজাদের ছ'শো বছরের রাজধানী শহর। তখন নাম ছিল রঙ্গপুর। শিব ও সাগর— মিলে শিবসাগর। ১২৯ একরের জলাশয় সাগরের মতো বিশাল। দক্ষিণপাড়ে শিবডোল অর্থাৎ শিবমন্দির। ১৭৩৪ সালে শিব সিংহের রানি এটি খনন করান। শিবরাত্রিতে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এখানে পুজো দিতে আসে। এর ডাইনে বিষ্ণুডোল ও বাঁয়ে দেবীডোল। পশ্চিমপাড়ে রয়েছে মিউজিয়ম। এখানকার মিকির উপজাতির জীবনযাত্রা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। চা ও তেলের জন্য বিখ্যাত অসমের এই জেলা সদর।

জানো কি?

- বাংলা বর্ণমালায় ৫১ টি বর্ণ আছে।
- স্বরবর্ণ ১১ টি। অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ।
- ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০ টি। ক খ গ ঘ ঙ ইত্যাদি।
- ৫১ টি বর্ণমালার পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২ টি। অ আ ই ঈ উ ঊ ক ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত দ ন ফ ব ভ ম ষ স য র ল হ ড় ঢ় য়।
- ৮ টি অর্ধমাত্রার ঋ খ গ ণ থ ধ প শ।
- ১০ টি মাত্রাহীন এ ঐ ও ঔ ং ঃ ঁ ঙ ঞ ৎ।

(এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণীয়)

ভালো কথা

সাড়ম্বরে পালিত রামনবমী

'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে সারা দেশে এবার পালিত হলো রামনবমী। শ্রীরামনবমী উদযাপন সমিতির উদ্যোগে আমাদের রঘুনাথগঞ্জেও সকাল থেকেই পুজোপাঠ শুরু হয়। দুপুরের পর আশেপাশের গ্রাম থেকে শোভাযাত্রা-সহ মানুষ আসতে শুরু করে। প্রসাদ বিতরণের পর বিকেল তিনটায় শোভাযাত্রা শুরু হয়। পাঁচ হাজার মানুষের শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। শেষে সবাইকে ঠাণ্ডা পানীয় দেওয়া হয়। শ্রীরামের নামে এত মানুষকে একসঙ্গে দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

সাগ্নিক বন্দ্যোপাধ্যায়, দশম শ্রেণী, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

আমার মা

সাত্ত্বিকা ভট্টাচার্য, চতুর্থ শ্রেণী, রাজাপুর, হাওড়া

আমার মায়ের মুখখানি হাসিখুশি ভরা
সুখে দুঃখে সবসময় সদাই আত্মহারা।
কাজে ব্যস্ত সবসময় তবু একটু সময় পেলে
আদর করে পড়তে বসায়, বকুনি দেয় প্রয়োজন হলে।

গুণ গুণ করে গান গায় আর জোরে কবিতা বলে
উঠতে বসতে খেয়াল রাখে, কেঁদে ভাসায় কিছু হলে।
মাগো আমার মা, তোমার নেইকো তুলনা
তুমি ছাড়া আমি যে মা বড়ো হতে পারবো না।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। অভিমন্যু।। ১০

দশম দিনে শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে শরবিদ্ধ করলেন।

কৌরবপক্ষের সেনাপতি হলেন দ্রোণাচার্য।

দ্রোণ ব্যর্থ হলেন। কৌরবরা মন্ত্রণা করেন।

সেলুলয়েডে বাঙালির ইতিহাস

সন্দীপ চক্রবর্তী

ভালো সিনেমার শক্তি সীমাহীন। বিশেষ করে সিনেমাটি যদি ইতিহাসভিত্তিক হয় এবং তথ্যে ও সত্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তাহলে তা স্বৈরাচারী শাসকের হিস্টিরিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাঙালি পরিচালক মিলন ভৌমিকের 'দাঙ্গা' সিনেমা হিসেবে কতখানি উত্তীর্ণ সেকথা বলার সুযোগ এখনও আসেনি। কারণ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছেন এবং প্রমাণ করে ছেড়েছেন দ্বিচারিতায় তার জুড়ি মেলা ভার।

গত বছরের শেষের দিকে সঞ্জয় লীলা বনশালির পদ্মাবত ছবির চিত্রনাট্যে বদল দাবি করে কারনি সেনা যখন আন্দোলন করছিল, তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বাংলায় ছবি রিলিজ করুন। কোনও গণ্ডগোল হবে না।' এহেন দৈবী অভয়বাক্যে ধন্য ধন্য পড়ে গিয়েছিল সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে। বিশেষ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের গঞ্জিকাসেবী বালক-বালিকাদের একাংশ জাতে নকশাল হয়েও মমতাকে সাধুবাদ জানাতে পিছপা হয়নি। সঙ্গে ছিলেন নরমপন্থী বামমার্গের কিছু মানুষও। এরা কামু-কাফকার অনুরাগী, কিন্তু ভারতবর্ষীয় পরম্পরার বিরোধী। মমতার মতো এরাও জানতেন পদ্মাবতের পক্ষে দাঁড়ালে লাভ আছে। এতে ইসলামি মৌলবিতন্ত্র খুশি হবে। শিক্ষিত মুসলমানও হালে পানি পাবে এবং আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে মুসলমানি দুয়ায় মমতার আঁচল উপচে পড়বে।

মিলন ভৌমিকের দাঙ্গার প্রেক্ষাপট অবশ্য আলাদা। এ ছবির নায়ক মুসলমান নন, হিন্দুও নন। এ ছবির নায়ক সময়। ছেচল্লিশের দাঙ্গাকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই ছবি। ধর্ষকাম সময়ের নগ্নরূপ ফুটিয়ে তুলতে পরিচালক ছবির ধরতাই হিসেবে বুনে দিয়েছেন একটি প্রেমকাহিনি। যেখানে প্রেমিক হিন্দু, প্রেমিকা মুসলমান। ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করার সপক্ষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি, মুসলমানরা

নাকি হিন্দু-মুসলমানের প্রেমকাহিনিতে ক্ষুব্ধ। তাই ছবি দেখানো যাবে না। আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় এই বালখিল্যপনায়। মমতা কি ভুলে গেলেন, ৯০-এর দশকে দক্ষিণের পরিচালক মণিরত্নম 'বম্বে' নামের একটি ছবি করেছিলেন। যে ছবির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু সেখানের ধরতাই হিসেবে বুনে দেওয়া হয়েছিল এক হিন্দু যুবক এবং এক মুসলমান মেয়ের প্রেমকাহিনি। কই, তখন তো কেউ আপত্তি করেনি! উল্টে ছবিটি সারা দেশকে অভিভূত করে বছরের সব থেকে বড়ো হিটের শিরোপা পেয়েছিল। তাহলে 'দাঙ্গায়' আপত্তি কেন?

উত্তরটা সহজ। মিলন ভৌমিকের ছবির অন্যতম প্রধান চরিত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। শ্যামাপ্রসাদকে সামনে রেখে পরিচালক দেখিয়েছেন ছেচল্লিশের দাঙ্গার প্রকৃত ইতিহাস। কারা ছিলেন দাঙ্গার নেপথ্যে? কী উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছিল বিশ্বের ইতিহাসে ভয়ঙ্করতম এই দাঙ্গা? জাদুকরি দক্ষতায় দেবত্বের মুখোশ সরিয়ে পরিচালক দেখিয়েছেন প্রাক্-স্বাধীনতা এবং সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের আসল চেহারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভয় এই ইতিহাসকে। বাঙালি এমনিতে কুম্ভকর্ণের জাত। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ঘুম আর ভাঙে না। কিন্তু ঘুম ভাঙলে বাঙালি যে-কোনও অচলায়তন টলিয়ে দিতে পারে। ব্রিটিশরা সেটা টের পেয়েছিল। জানতেন গান্ধী-নেহরুর মতো নেতারাও। মমতাও বিলক্ষণ জানেন। হাজার হোক তার ধাক্কাধাক্কিতেই তো বাঙালি চৌত্রিশ বছরের বাম-কূপমণ্ডুকতা থেকে জেগে উঠেছিল। তারপর কী হয়েছিল সবাই জানেন। এই বিরল গুণের জন্যে তাবড় বাম নেতারা রাজনীতির আফিম খাইয়ে বাঙালিকে দীর্ঘকাল ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন। মমতার আমলে আফিমের চাষ আরও বেড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোথাকার কোন মিলন ভৌমিক ইতিহাসের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে যদি বাঙালির আবগারি মৌতাত ভেঙে দেন তাহলে মমতা তো ঘোর বিপদে পড়বেন। তাই তিনি ছবির প্রদর্শনী বন্ধ করে দিয়েছেন এবং তা করতে গিয়ে ব্যবহার করেছেন মুসলমানদের।

তবে একটা প্রশ্ন থেকেই গেল। মিলন ভৌমিক বিচারের আশায় আদালতে গেছেন। আদালত যদি তার পক্ষে রায় দেয় তাহলে ছবির প্রদর্শনীতে কোনও বাধা থাকবে না। তখন মমতা কী করবেন? ইতিহাসের কষ্টিপাথরকে অকেজো করে দিতে পারবেন কি? যদি না পারেন তাহলে কিন্তু তার শেষের সেদিন খুব দূরে নয়। ■

আশিস দেবরাল

প্রযুক্তিবিদ থেকে সংস্কারক

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একটা সময় ছিল যখন উত্তরাখণ্ডের মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি, গ্রাম-শহর ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যেতেন। মূলত দারিদ্র্য এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও চাকরি-বাকরির অভাবই ছিল এর কারণ। ২০০০ সালে রাজ্যটি তৈরি হবার পর ২০০টি স্কুল চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেখানে একটিও ছাত্র ছিল না।

রাজ্যের এই হতাশাজনক ছবিটা পালটাতে সরকারের পাশাপাশি বহু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকী অনেক ব্যক্তিও এগিয়ে এসেছিলেন। এদেরই একজন ৩৪ বছর বয়েসি প্রযুক্তিবিদ আশিস দেবরাল। আশিস সপ্তাহে একদিন ৭২০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে গুরুগ্রাম থেকে উত্তরাখণ্ডে নিজের গ্রামে এসে বাচ্চাদের পাঠ দেন। শুধু প্রথাগত শিক্ষাই নয়, বাচ্চারা তাঁর কাছ থেকে হস্তশিল্প এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও অনেক কিছু শিখতে পারে।

আশিসের জন্ম উত্তরাখণ্ডের পাউরি গাড়োয়াল জেলার তিমলি গ্রামে। তিনি বুঝেছিলেন চিকিৎসা পরিষেবা এবং কর্মসংস্থানের অভাবের জন্যই এখানকার মানুষ পিতৃপিতামহের ভিটে ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষার হালও সে সময় খুব খারাপ ছিল।

মাইক্রোসফটের অ্যাকাডেমি থেকে সার্টিফিকেট কোর্স করার পর আশিস দেশবিদেশের অনেক জায়গায় চাকরি করেছেন। এখন তিনি গুরুগ্রামের বাসিন্দা। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দূরে থাকলেও যে গ্রামে আমি জন্মেছি তার কীসে উন্নতি হবে সে ব্যাপারে আমি সবসময় চিন্তা করতাম। ১৮৮২ সালে আমার প্রপিতামহ একটি স্কুল করেছিলেন। নাম তিমলি সংস্কৃত পাঠশালা। সেই স্কুলে এখানকার বহু ছেলে সংস্কৃত, হিন্দি এবং ইংরিজি শিখেছে। আমারও সেরকমই কিছু করতে ইচ্ছে করত।'

কথায় বলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। ২০০৯ সালে নিজের সঞ্চয় ভেঙে এবং বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে ধার করে আশিস একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। ২০১৪

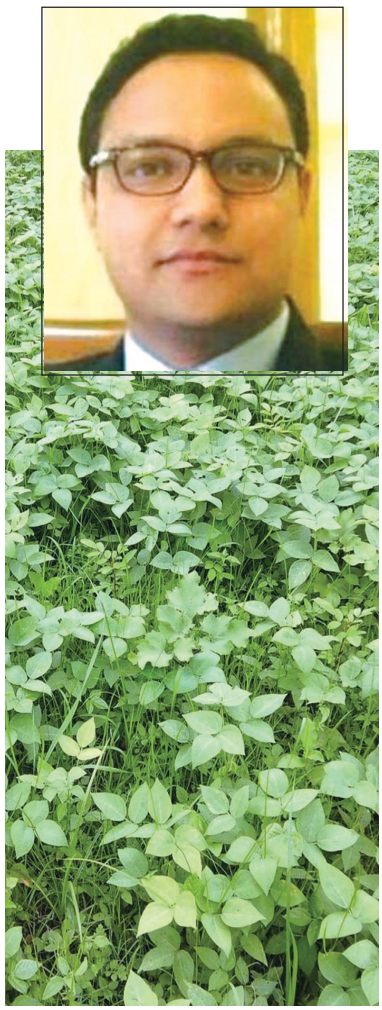

সালে তৈরি হয় তিমলি বিদ্যাপীঠ। এই অঞ্চলে প্রযুক্তি এবং কম্পিউটারের এবিসিডি শেখার একমাত্র কেন্দ্র। আশিস বলেন, 'এখনও পর্যন্ত আমরা ৭০ জনকে কম্পিউটারের প্রাথমিক পাঠ দিতে পেরেছি। তারা ১২ মাসের কোর্স শেষ করেছে। এছাড়া আমরা গ্রামের লোককে প্যানকার্ড পাসপোর্ট তৈরির পদ্ধতি শেখাচ্ছি। গ্রামের অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা এখন অনলাইনে কেনাকাটা করার পদ্ধতি শিখে গেছে।' ২০১৫ সালে আশিস গরিব এবং পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য আর একটি স্কুল করেছেন। তিনজন শিক্ষক সেখানে পড়ান। আশিস বলেন, '২০১৬ সালে, আমি যেখানে চাকরি করি সেই ব্রিটিশ টেলিকম প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে ডিজিটাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাকে ৫০,০০০ টাকা পুরস্কার দিয়েছিল। আমি সেই টাকায় স্কুলের চারটি ঘর তৈরি করেছি।'

অন্য রকম

সাধারণ স্কুলের সঙ্গে তিমলি বিদ্যাপীঠের পার্থক্য হলো, স্কুলটি একাধিক ব্রিটিশ স্কুলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে চলে। ব্রিটিশ স্কুলের সঙ্গে ভাবগত এবং তথ্যগত আদানপ্রদানের ফলে ভারতীয় ছাত্ররা পেশাদারিত্ব এবং নেতৃত্বদানের বিষয়েও অনেক কিছু শিখতে পারে। ইংরিজি শেখে খোদ ব্রিটিশ শিক্ষকদের কাছে। তবে শুধুই গ্রহণ নয়। আশিস বলেন, 'আমরা ওদের যোগ এবং ধ্যান করতে শেখাই। আমাদের ছেলেরা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ওদের সঙ্গে কথা বলে। আরও একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের স্কুলের আছে। এখানে রোবটিক্স শেখানো হয়। ২০১৭ সালে বিশ্ব রোবটিক্স অলিম্পিয়াডে আমরা অংশগ্রহণও করেছি।'

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে আশিস দেবরালের চেষ্টার ফলে তিমলি থেকে অন্য রাজ্যে চলে যাবার ঘটনা অনেকটাই কমে গেছে। এর অন্যতম কারণ কর্মসংস্থানের সুযোগ। আশিস বলেন, 'আমরা উত্তরাখণ্ডের দু'জন মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে শংসাপত্র পেয়েছি। সরকারি স্কুলগুলির বহু ছাত্র আমাদের ইনফর্মেশন এবং কমিউনিকেশন সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। পাওয়ার টিলার প্রযুক্তি কৃষকদের শিখিয়ে আমরা প্রায় ২৫০টা পতিত জমিতে আবার চাষাবাদ শুরু করেছি। অল্পবয়েসি ছেলেদের মধ্যে কৃষি নিয়ে উৎসাহ বাড়ছে। আমরা জৈব চাষ নিয়ে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছি।' ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রসঙ্গে আশিস বলেন, 'পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা শ্রী তিমলি বৈদিক শিক্ষা এবং গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তুলব। গুরুকুল ভিত্তিক এই কেন্দ্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলার জন্য আমরা ভারতের প্রাচীন রীতিপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করব। ফুল এবং খাদ্যশস্য চাষ ও দুগ্ধ উৎপাদন প্রকল্পে এখানকার ছেলেদের কর্মসংস্থান হবে।'

বোঝাই যায় আশিস দেবরালের হাত ধরে তিমলি এক সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। দুর্ভাগ্য, ভারতের সব গ্রামে আশিস দেবরালরা জন্মান না। না হলে ভারতীয় গ্রামের চেহারা আরও দ্রুত বদলে যেত! ■

ভারত ভাগের বলি উদ্বাস্তু ভারতবাসীর নয়া সংকট

চন্দন রায়

কিছু দিন ধরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অসমে এন আর সি আইন বলবৎ করা নিয়ে ভারতের রাজনীতিতে এবং দৈনিক খবরের কাগজগুলিতে হইচই শুরু হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২ মার্চের মধ্যরাতের পরে বিভিন্ন সময়ে ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের বলি যে সমস্ত বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠী ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে তারা আজ দ্বিতীয়বার বাস্তুচ্যুত হওয়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ভারত ভাগের বলি উদ্বাস্তু পরিবারের সন্তান হয়ে ভারতের মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, ভারত সরকার এবং দেশভক্ত ভারতবাসীদের কাছে কয়েকটি প্রশ্ন রাখছি।

১. ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগের সময় পূর্ববাংলাকে ভারত ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) নামক ভূখণ্ডের সৃষ্টি হলো, যা ইসলামি রাষ্ট্র এবং শুধুমাত্র মুসলমান জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত। কিন্তু ওই ভূখণ্ডে বসবাসরত বাঙালি হিন্দুজনগোষ্ঠী ভারতীয় নাগরিকদের ভারতের নাগরিকত্ব কী কারণে বা কোন আইন বলে বাতিল হলো?

২. ওই ভূখণ্ডে বসবাসরত বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠী কোনদিনই স্বেচ্ছায় ভারতের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেনি। এমনকী ভারত ভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির দাবিতে সমর্থন করেনি। তাহলে তারা কেন ভারতের নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

৩. ভারত ভাগের সময় যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক পৃথিবীর অন্য দেশে (বাংলাদেশ ছাড়া) বসবাস করত তখন তাদেরও কি ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল হয়েছিল? যদি তাদের স্বেচ্ছায় নাগরিকত্ব বাতিল না হয়ে থাকে, তবে দুর্ভাগ্যবশত পূর্ববাংলায় বসবাসরত ভারতীয় নাগরিকদের নাগরিকত্ব কেন বাতিল হবে?

৪. ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে আজ পর্যন্ত স্বাধীন ভারত সরকার কখনও পূর্ব বাংলায় বসবাসরত ভারতীয়দের পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা ত্যাগ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ভারতে চলে আসার জন্য নোটিশ বা নির্দেশ জারি করেনি। সুতরাং অবরুদ্ধ বিচ্ছিন্ন ভারতবাসী কোন আইনে বিদেশি নাগরিক হিসাবে গণ্য হলো?

৫. দেশভাগের পর অবরুদ্ধ বিচ্ছিন্ন ভারতীয়দের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে আসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকারের ভারত (শত্রু দেশ) নীতির কারণে পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে আসা আইনত কঠোর দণ্ডণীয় অপরাধ হিসাবে বিবেচিত ছিল। সেই সময় ভারত সরকারের উদাসীন নীতির কারণে অসহায়, নিরুপায়, অবরুদ্ধ হিন্দুরা স্বাধীন ভারতের নাগরিকত্ব অর্জন করতে পারেনি। এই অবস্থার জন্য প্রকৃত দায়ী কারা?

৬. ১৯৬৫ সালের ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় থেকে পাকিস্তানে অবরুদ্ধ ভারতীয়রা পাকিস্তানের শত্রুতে পরিণত হলো। তাদের বিষয় সম্পত্তি ঘোষিত হলো শত্রু-সম্পত্তি বলে, শত্রু-সম্পত্তি আইন তৈরি হলো, বিষয় সম্পত্তি বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। শারীরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্য চরমসীমায় পৌঁছাল। হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভারত প্রবেশের অনুমতি বাতিল করা হলো। সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। কী অপরাধ করেছিল ওই সমস্ত হতভাগ্য অবরুদ্ধ ভারতীয়রা?

৭. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে পাকিস্তান থেকে আলাদা রাষ্ট্র হলেও হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তানের মতো বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিক্ষেত্রেই প্রযোজ্য রইল। শত্রু-সম্পত্তি আইন, রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইসলামি অনুশাসন বলবৎ রইল। এমতাবস্থায় বাংলাদেশে অবরুদ্ধ হিন্দুদের ভিটেমাটি ত্যাগ করে নিঃস্ব হয়ে ভারতের রেললাইনের ধারে মাটে ঘাটে, খালপাড়ে শোচনীয় কলোনি জীবন বেছে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কারা তাদের এই অবস্থার জন্য দায়ী? কেন তারা তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে ছেড়ে নিজ দেশে পরবাসী হবে? ভারত ভাগের কারিগররাই কি দায়ী নয়?

৮. ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে পূর্ববাংলার হিন্দু জনগোষ্ঠীর কি কোনও অবদান ছিল না? মাস্টারদা সূর্য সেন প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, গণেশ ঘোষ, কবি মুকুন্দদাস, অশ্বিনী দত্ত প্রমুখ হাজার হাজার স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বাজি রেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তারা বা তাদের পরিবারবর্গ স্বাধীন ভারতে একটু জায়গা পাবে না কেন?

৯. সম্প্রতি অসমে বা অন্য কোনও রাজ্যে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এন আর সি আইনে বিদেশি অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে তা অবশ্যই প্রশংসনীয় পদক্ষেপ, কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত বাস্তুচ্যুত ভিটেমাটি হারা হিন্দু জনগোষ্ঠী যারা ভারত ভাগের শিকার যাদের স্বাধীন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল পুনরায় তারা শত অত্যাচার নির্যাতন ভোগের পর স্বপ্নের ভারত ভূমিতে একটু আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে তাদের যদি বিদেশি হিসাবে বিদেশি আইনে শনাক্ত করা হয় মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের এন আর সি আইন উদ্বাস্তু হিন্দু ভারতবাসীর কাছে কালাকানুন হিসাবে ইতিহাসের পাতায় স্থান পাবে। তাই সমস্ত দেশভক্ত দেশপ্রেমী ভারতবাসীর কাছে আহ্বান পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অবহেলিত উদ্বাস্তুদের জন্য পাশে আওয়াজ তুলুন, আমরা সবাই ভারতীয়। স্বাধীন ভারত হিন্দু জনগোষ্ঠীর পুণ্যভূমি, শান্তির বাসস্থান। ■

ফ ঃ ৬

কৃষি আন্দোলনে চাষিদের দুর্দশা মোচনের চেয়ে রাজনীতি বেশি হচ্ছে

তারক সাহা

দিকে দিকে ক্ষমতা হারানোর পর বাম আন্দোলন অক্সিজেন পাওার চেষ্টা করছে, কৃষকদের নিয়ে লং মার্চ করে। নেতৃত্বের পুরোভাগে ছিলেন বাংলার সিপিএম নেতা হান্নান মোল্লা। ইস্যু হলো কৃষকদের ঋণ মকুব। কিন্তু এই লং মার্চ দেশ জুড়ে বেশ সাড়া ফেলেছে। আমজনতা ভাবছে বাম তথা বিরোধীদের আন্দোলন যথার্থ এবং তাদের সহানুভূতি কৃষকদের সঙ্গেই। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বিপরীত। যেহেতু ইস্যুটা সারাদেশের, তাই বিজেপির বিরুদ্ধে এককাট্টা হওয়া বিরোধীদের পালে হাওয়া তুলে দিয়েছে। কৃষক তথা বিরোধীদের দাবি সরকার কৃষকদের ঋণ ও বিদ্যুৎ বিল সম্পূর্ণভাবে মকুব করুক। ক্রমবর্ধমান কৃষক আন্দোলন কিন্তু কোনওভাবেই গ্রামীণ দুর্দশার মাপকাঠি নয়, বরং এই আন্দোলন বিবিধ দাবি দাওয়ার ওপর ঘৃতাহুতি দেবে। আন্দোলন দেশব্যাপী হলেও এই আন্দোলন মূলত উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, রাজস্থান ও কর্ণাটকের মতো রাজ্যগুলিতে সীমাবদ্ধ। ইতিমধ্যে অনাদায়ী কৃষি ঋণ ২ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬ শতাংশ। একটা কারণ এই হতে পারে অধিকতর ঋণ নিয়ে অনেক কৃষক হয়তো আশায় বুক বাঁধছে যে, তাদের সমগ্র ঋণ এই আন্দোলনের ধাক্কায় মকুব হয়ে যাবে।

আমাদের দেশে সবচেয়ে মুশকিল হলো ধনী ব্যক্তিরা অতি সহজেই ঋণ পেয়ে যায় বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অথবা আর্থিক সংস্থা থেকে। তাই এদেশে বিজয় মালিয়া, নীরব মোদীরা দেশের নাগরিকদের কষ্টার্জিত পয়সা লুটে পালিয়ে যেতে পারে। কৃষিঋণও এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের সম্পন্ন কৃষকরাই এইসব সরকারি ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়ে থাকে। কিন্তু গরিব কৃষক বা কৃষির সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা সরকারি এই সুবিধা থেকে প্রায় বঞ্চিত। নিরুপায় এই শ্রেণীর মানুষ সুদের অধিক হারে গ্রামীণ সুদখোরদের কাছ থেকে ঋণ নেয়। কৃষকদের এই ঋণ মকুবে কিন্তু লাভবান তারাই হবে যাদের আছে ভুরি ভুরি অর্থ।

দেশে এমন সব কৃষি পরিবার আছে যাদের শত শত একর জমির মালিকানা রয়েছে এবং পঞ্জাবে এমন একজন কৃষক রয়েছে যার ১৫০টি নলকূপ আছে। ছোট প্রান্তিক চাষিদের আদৌ কোনও নলকূপ নেই। তাই দেশের সম্পন্ন ধনী চাষিরাই এই মুফত্ বিদ্যুতের গ্রাহক। ভূমিহীন শ্রমিকরা এইসব কৃষকদের থেকে অনেক গরিব হয়েও সরকারি এই সহায়তা তাদের দুয়ার অবধি পৌঁছয় না।

কৃষকরা যেহেতু দেশের সমস্ত মানুষের খাদ্য সংস্থান করে তাই শুধু এই দেশেই নয় সারা বিশ্বেই এরা ক্ষমতাবান লবি। আমেরিকার মতোই ভারতেও মানুষের দুই-তৃতীয়াংশই গ্রামবাসী, সুতরাং চাষ আবাদ দেশের আম-নাগরিকদের খাদ্য সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের এক বিপুল জনসংখ্যার রুজি-রোজগারের উৎস। সুতরাং এদের অনেকাংশই দেশের রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সংযোগের সঙ্গে দেশে রাজনৈতিক উত্থান পতন ঘটায়। এখন দেশের সাধারণ মানুষকে কৃষক আত্মহত্যার তথ্য খাওয়ানো হচ্ছে। ২০১২ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে আত্মহননের হার দেশে সর্বাধিক বেকারদের মধ্যে। কাজ না পাওয়া যুবক-যুবতীদের আত্মহননের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে চাষ-আবাদের সঙ্গে যুক্ত মানুষের আত্মহননের চেয়ে তিনগুণ বেশি। দক্ষিণী রাজ্যগুলির আত্মহননের সংখ্যা উত্তরের রাজ্যগুলির চেয়ে দশগুণ বেশি এবং এর বিভিন্ন কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ সংস্কৃতিগত। নীতি আয়োগের কর্তা অরবিন্দ পানগাড়ারিয়ার মতে মাত্র ২৫ শতাংশ আত্মহননের ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে কৃষি যুক্ত।

পুদুচেরি দেশের মধ্যে কম কৃষি ভিত্তিক রাজ্য হয়েও কৃষিসংক্রান্ত আত্মহত্যায় এই রাজ্যটি সেরা এবং এর পরের রাজ্যটি হলো কেরল। অবধারিতভাবে কৃষিজ উৎপন্ন ফসলের কম দামের সঙ্গে এর সাযুজ্য নেই। তাই এর মধ্যে রাজনৈতিক রং এসে পড়ছে অবধারিত ভাবেই।

আত্মহননের মধ্যে যেসব কারণগুলি থাকে তার মধ্যে রয়েছে মানসিক চাপ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনমন। কিন্তু এই অসুখ সারানোর কোনও দায় নেই কারুরই। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে সাল অনুযায়ী কৃষক আত্মহননের হার নিম্নমুখী। *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

এই হার দেশের মোট আত্মহননের যে ঘটনা ঘটে তার মাত্র ৮ শতাংশ। অথচ দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। কৃষক মৃত্যুর এই হার নিয়ে চর্চা হতেই পারে, কারণ এই তথ্য সঠিক নয়। তবুও বলা যায় এই মৃত্যুর হার কমছে। সংসদে পেশ করা প্রশ্নের উত্তরে জানা যায় যে, এই মৃত্যুর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে যা ২০১৫ সালে ৪৫৯৫ থেকে ২০১৬ সালে হয়েছে ৫,০১৯। তবুও এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সম্পন্ন কৃষকদের সঙ্গে এবং সব মিলিয়ে এই দুই সালে মৃত্যুর হার দক্ষিণমুখী। অর্থাৎ এই সংখ্যা ৪০০৭ থেকে নেমে হয়েছে ৬৩৫১ জন। এর থেকে স্পষ্ট যে, গ্রামীণ অর্থনীতির সংকট সীমাবদ্ধ মূলত ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের মধ্যেই। ■

সারণী

সাল	সংখ্যা
১৯৯৫	১১,০০০
২০০৪	১৮,২৪১
২০১৫	১২,৬০২
২০১৬	১১,৩৭০

বৈশাখ মাসে সবজি চাষ

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

পুঁই :

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাস বর্ষার পুঁইয়ের বীজ ফেলার আদর্শ সময়। পুকুরের পাঁক তুলে শুকিয়ে জমিতে দিলে পুঁইয়ের বৃদ্ধি ভালো হয়। তাই অনেক চাষিকে দেখা যায় ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে শুকিয়ে যাওয়া পঙ্কিল পুকুরে মাদা করে পুঁইয়ের বীজ বুনতে। পুঁইয়ের মাটি বেশ কয়েকবার চাষ দিয়ে গুঁড়ো ও ঝুরঝুরো করে নিতে হবে। সেই জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে বিঘা প্রতি ১০ গাড়ি খামার পচা সার, কেঁচো-সার বা ভার্মি-কম্পোস্ট অথবা গোবর সার। শেষ চাষে মেশাতে হবে বিঘা প্রতি কুড়ি কেজির মতো ইউরিয়া, চার কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং আট কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ।

এক বিঘা জমিতে দু' কেজি পুঁই বীজ লাগবে। বীজ শোধন করে নিতে হবে। বীজ শোধনের জন্য প্রতি কেজি বীজে ৪ গ্রাম থাইরাম অথবা ম্যাঙ্কজেব বা ক্যাপটান অথবা ৩ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মেশানো দরকার। জৈব পদ্ধতিতে প্রতি কেজি বীজে পাঁচ গ্রাম হারে ট্রাইকোডারমা ভিরিডি এবং সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স নামক জীবাণু মিশিয়ে শোধন করা যায়। এদের দ্রবণে বীজ ভিজিয়ে ছায়ায় শুকিয়েও বীজ বপন করা যায়। এতে প্রাথমিক অবস্থায় পুঁইয়ে গোড়া পচা এবং পাতার বাদামি-দাগ রোগ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

পুঁই লাগানো হয় সারিতে, ভেলিতে বা মাদায়। বীজ বোনা ছাড়াও অনেকে তৈরি চারা মূল জমিতে বসান। পনেরো থেকে ত্রিশ সেন্টিমিটার লম্বা চারা ৯০×৬০ সেন্টিমিটার দূরত্বে বসাতে হবে। বীজ বোনার তিন ও ছয় সপ্তাহ বাদে বিঘা প্রতি দশ কেজি হারে ইউরিয়া চাপান সার দিলে পুঁইয়ের ডগডগে যৌবন লক্ষ্য করা যায়।

বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠমাসের ঝড়বৃষ্টিতে কিছুটা সেচের প্রয়োজন মেটে; তবে জমিতে আর্দ্রতার ঘাটতি হলে পাঁচ-ছয় দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। মাঠের নিকাশি বন্দোবস্ত ঠিক হওয়া দরকার।

জমিতে প্রাথমিক অবস্থায় নিড়ানি দেবার সময় ঘন গাছ তুলে পাতলা করতে হয়। এই গাছ বাজারে ভালো দরে বিকোয়। প্রতি বিঘায় যিনি ত্রিশ কুইন্টাল পুঁই তুলতে পারেন, তিনিই ভালো চাষি।

কচু :

বৈশাখ মাস কচু লাগানোর সময়। ফাল্গুন থেকে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত কচু রোয়া যাবে। কালি, ধলি ভালো জাত। প্রতি বিঘায় বীজ-কচু লাগবে ৭০ থেকে ১৪০ কেজি। ৬০×৩০ সেন্টিমিটার দূরত্বে কচু লাগাতে হবে। বিঘা প্রতি ১৫, ২৫ এবং ৭ কেজি করে যথাক্রমে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অব পটাশ প্রাথমিক সার দিন। যারা চৈত্রমাসে কচু লাগিয়েছেন তারা বৈশাখ মাসে (রোয়ার একমাস পর) ১৫ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে দিন।

ওল :

বৈশাখ মাস ওল লাগানোর সময়; চৈত্রমাসেও লাগানো শুরু করা যায়। সাঁতরাগাছি, কাভুর প্রভৃতি ভালো জাত। বিঘায় ১২০ কেজি বীজ-ওল লাগবে। ৭৫×৭৫ সেন্টিমিটার দূরে ওলের কন্দ লাগাতে হবে। প্রাথমিক সার হিসাবে বিঘায় যথাক্রমে ১৫, ৫০ এবং ২২ কেজি হারে ইউরিয়া, সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং মিউরিয়েট অব পটাশ লাগবে। যারা চৈত্রমাসে ওল লাগিয়েছেন তারা বৈশাখ মাসে (এক মাস বাদে) বিঘা প্রতি ১২ কেজি চাপান সার দিন।

ঢ্যাঁড়স :

বর্ষাকালীন ঢ্যাঁড়স চাষের জন্য বৈশাখ মাস থেকে ঢ্যাঁড়সের বীজ বোনা শুরু হবে। আষাঢ় মাস পর্যন্ত তা বোনা যায়। বীজের হার হেক্টর (সাড়ে সাত বিঘা) প্রতি ১০ কেজি; চারার দূরত্ব ৬০×৩০ অথবা ৪৫×৩০ সেমি। ০.২ শতাংশ ব্যাভিস্টিন দ্রবণে ভিজিয়ে বীজ শোধন করলে ঢলে পড়া রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রতি হেক্টরে ৫০ থেকে ৭০ হাজার চারা থাকে। বীজ বোনার আগে হেক্টর প্রতি ২০ থেকে ২২ কেজি ফিউরাডান ৩ কেজি কীটনাশক দানা ছড়ালে নানান কীটশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

লাউ ও কুমড়ো :

বর্ষার লাউ পেতে হলে বৈশাখ মাসে বীজ বুনন; জ্যৈষ্ঠমাসেও বোনা যাবে। দূরত্ব রাখুন ১ মিটার ৮০ সেন্টিমিটার × ১ মিটার ২০ সেন্টিমিটার। লাউয়ের উন্নত জাত হলো পুসা সামার প্রলিফিক লং, পুসা সামার প্রলিফিক রাউন্ড, পুসা মঞ্জরি, পুসা নবীন, অর্ক বাহার ও নানান হাইব্রিড বা সংকর জাত।

পাহাড়ি এলাকায় যারা চৈত্রমাসে লাউ ও কুমড়ো বুনেছেন তারা বৈশাখ মাসে (বোনার এক মাসের মাথায়) প্রথমবার এবং জ্যৈষ্ঠমাসে (বোনার দু' মাস পর) দ্বিতীয় বার চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন দিন। চাপান সার হিসাবে প্রতিবার হেক্টর প্রতি (সাড়ে সাত বিঘা) সাড়ে বারো থেকে পনেরো কেজি করে নাইট্রোজেন দিতে হবে। নাইট্রোজেনকে ইউরিয়াতে হিসাব করতে হলে ২.২ দিয়ে গুণ করুন। ■

কাশ্মীরে সেনা সংঘর্ষে নিহত জঙ্গি অধ্যাপক

নিজস্ব সংবাদদাতা।। কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার শিক্ষক মহম্মদ রফি ভাট আকস্মিকভাবেই নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। চৌত্রিশ বছর বয়সী এই সমাজবিদ্যার শিক্ষক নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় হইচই পড়ে যায় চতুর্দিকে। তাদের শিক্ষককে খুঁজে দেওয়া হোক— এই দাবিতে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য খুরশিদ আগরাবি পুলিশের কাছে চিঠি লিখে নিখোঁজ অধ্যাপককে খুঁজে দেওয়ার দাবিও জানান। জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশের ডিজিও বলেন, নিখোঁজ অধ্যাপককে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। অবশেষে এই নিখোঁজ অধ্যাপকের মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই জানা যায়— তিনি নিখোঁজ হয়ে যাননি। তিনি স্বেচ্ছায় জঙ্গি শিবিরে যোগ দিয়েছেন। এই সূত্র পেয়েই কাশ্মীরের শোপিয়ানে হিজবুল জঙ্গিদের ডেরায় হানা দেয় সেনাবাহিনী। সেখানে সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে ওই জঙ্গি-শিক্ষক-সহ আরও চার জঙ্গি নিহত হয়েছে। নিহত জঙ্গিদের মধ্যে রয়েছে হিজবুল কল্যান্ডার সাদাম পাদের। শোপিয়ানের ওই জঙ্গি ঘাঁটিতে সেনাবাহিনী অভিযান চালালে জঙ্গিদের আড়াল করতে এগিয়ে আসে স্থানীয় কিছু যুবক। সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে তারা পাথর ছুঁড়তে থাকে। সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে ছ'জন স্থানীয় বাসিন্দাও নিহত হয়।

সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় সূত্রের খবর, কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই অধ্যাপক দিনদুয়েক ধরে নিখোঁজ ছিলেন। শুক্রবার নমাজের পরে তিনি মোবাইলে তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তারপর থেকেই তাঁর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তাঁর মোবাইল ফোনটিও বন্ধ ছিল। এই শিক্ষকের নিখোঁজ

মহম্মদ রফি ভাট

হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। কিন্তু তিনি যে স্বেচ্ছায় জঙ্গি শিবিরে গিয়ে যোগ দিয়েছেন— তা আন্দাজ করতে পারেনি কেউ। দিন দুয়েক পরে হঠাৎই নিখোঁজ অধ্যাপকের মোবাইল ফোনটি রাতের দিকে সামান্য সময়ের জন্য চালু হয়। আর তখনই মোবাইলের অবস্থান ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে অধ্যাপক ভাট শোপিয়ানের জাইনাপোরায় বাদিগামের কাছে রয়েছেন। ভাটের মোবাইলের কললিস্ট পরীক্ষা করেও পুলিশ বুঝতে পারে, তিনি গত কয়েকদিন ধরেই জঙ্গিদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যাচ্ছিলেন।

এরপরই অধ্যাপক ভাটের পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে সেনাবাহিনী বাদিগামে অভিযান চালায়। বাদিগামের একটি এলাকা ঘিরে ফেলে সেনাবাহিনী। লাউড স্পিকারে জঙ্গিদের বারবার আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। ভাটের পরিজনরাও ভাটকে ফোনে আত্মসমর্পণ করতে অনুরোধ জানান। কিন্তু ভাট তাঁদের পরিষ্কার জানিয়ে দেন, 'তোমাদের আঘাত দিয়ে থাকলে ক্ষমা করো। কিন্তু আত্মত্যাগের পথ ছেড়ে আমি ফিরতে পারব না।' এর পরই হিজবুল জঙ্গিবাহিনী সেনাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে। সেনা-জঙ্গি গুলির সংঘর্ষে এক সেনা ও দুজন পুলিশকর্মী আহত হন। অধ্যাপক ভাট-সহ যে চারজঙ্গি নিহত হয়েছে, তাদের ভিতর হিজবুল কম্যান্ডার সাদান পাদের ছিল বুরহান ওয়ানির ঘনিষ্ঠ। পাদেরের মৃত্যুর পর বুরহানের দলের আর কোনও জঙ্গি অবশিষ্ট রইল না। এর পরই সোপিয়ান ও কুলগামে সেনাকে লক্ষ্য করে একদল মানুষ পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। পথে কাঁদানে গ্যাস ও ছররা চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে সেনা। কিন্তু হামলা আরও জোরদার হলে বাধ্য হয়ে গুলি চালায় সেনা। এতেই ছ'জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়। এদিকে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই অধ্যাপকের জঙ্গি শিবিরে যোগদানের ঘটনা সম্পর্কে ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা বলেছেন, 'অধ্যাপক ভাটের মতো শিক্ষিত যুবকরা কেন জঙ্গিদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন— সেটাই ভাবনার বিষয়।'

এদিকে, নিহত এই অধ্যাপকের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, কৈশোরে একবার পালিয়ে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে যেতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন ভাট। তখনই পুলিশ তাঁকে ধরে পরিবারের হাতে সমর্পণ করে চোখে চোখে রাখতে বলে। বাটের বাবা ফৈয়াজও একসময় জঙ্গি সংগঠনের ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি সরে আসেন। ভাটের দুই খুড়তুতো ভাই জঙ্গি সংগঠনে নাম লিখিয়ে সংঘর্ষে মারা যায়। তবে, ভাটকে তাঁর পরিবারের লোকজন চোখে চোখেই রাখছিলেন। তিনি যাতে জঙ্গি সংসর্গে না পড়েন, তার জন্য ভাটের পিতা ফৈয়জ তাঁকে উচ্চশিক্ষার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর সবাই বুঝতে পারছেন— কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অধ্যাপকের সঙ্গে জঙ্গিদের একটি গোপন যোগাযোগ বরাবরই ছিল।

প্রকাশ্য নমাজে নারাজ খট্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে যে কথাটি কেউ প্রকাশ্যে বলতে সাহস করে না, সেই কথাটিই এবার বলে দিয়েছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর। সম্প্রতি হরিয়ানায় খোলা জায়গায় নমাজ পড়া নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। খোলা জায়গায় নমাজ বন্ধ করার দাবিতে বিক্ষোভও দেখায় কয়েকটি সংগঠন। এ নিয়ে গুরুগ্রামে অশান্তিও হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খট্টর বলেছেন— 'আমরা যদি সঠিকভাবে বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে বুঝতে পারব, নমাজ পড়া উচিত মসজিদ বা ঈদগাহে। কোনও রাস্তায় বা প্রকাশ্যে খোলা জায়গায় তা পড়া উচিত নয়। একান্তই যদি মসজিদ বা ঈদগাহে জায়গা না থাকে— তাহলে ব্যক্তিগত কোনও স্থানে পড়া উচিত। নমাজ এমন একটি ধর্মীয় আচার— তা প্রকাশ্যে প্রদর্শিত হওয়া উচিত নয়। কাজেই আমরা সবাইকে অনুরোধ করছি প্রকাশ্যে না পড়ে নির্দিষ্ট স্থানে নমাজ পড়ার জন্য।'

খট্টরের এই সাহসী বক্তব্যকে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন, কোনওরকম অনুমতি ব্যতিরেকে প্রকাশ্যে রাস্তায় বা খোলা জায়গায় যেভাবে নমাজ পড়া হয়— তাতে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। অসুবিধা হয় পথচারীদেরও। প্রকাশ্যে রাস্তা আটকে নমাজ পড়ার এই প্রবণতাও ক্রমশ বাড়ছে।

সংখ্যালঘু মন জয়ের জন্য কোনও সরকারই কখনও এইভাবে রাস্তা আটকে নমাজ পড়ার বিরোধিতা করেনি। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যে নমাজ পড়ার প্রবণতা যেভাবে বাড়ছে, তাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাও কোথাও কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে খট্টরের বক্তব্য সমর্থনযোগ্য— বলছেন অনেকেই।

প্রকাশ্যে নমাজ পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালিদের বারোয়ারি দুর্গাপূজার কথাও কেউ কেউ টেনে এনেছেন। তাঁরা বলছেন— কলকাতা শহর এবং অন্যান্য অঞ্চলেও বাঙালিদের সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সময় প্রকাশ্যে রাস্তায় প্যান্ডেল করে পূজার আয়োজন করা হয়। কিন্তু সেটি বছরের মাত্র চারটি দিন। তাও পুলিশ এবং প্রশাসনের অনুমতি নিয়েই তা করা হয়। অথচ, প্রকাশ্যে রাস্তা আটকে নমাজ সারা বছরই পড়া হয়। তার চেয়েও বড় কথা— এভাবে রাস্তা আটকে নমাজ পড়ার জন্য পুলিশ-প্রশাসনের কোনও অনুমতিও নেওয়া হয় না।

এর আগে হরিয়ানার বিভিন্ন জেলায় 'সংযুক্ত হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি' প্রকাশ্যে নমাজ বন্ধ করার দাবিতে প্রচার চালাতে শুরু করে। তাদের এই প্রচার অভিযান বেশ ভালো সাড়াও পায়। এদের সঙ্গে আরও বেশ কিছু সংগঠনও যোগ দেয়। গত ৪ মে গুরুগ্রামে প্রকাশ্যে নমাজ পড়ার আসর বসলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশও সেদিন প্রকাশ্য নমাজ পাঠের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এই ঘটনার উল্লেখ করে খট্টর বলেছেন, 'যতক্ষণ না কোনও ব্যক্তি প্রকাশ্যে নমাজ পড়ায় বাধা দিচ্ছেন, ততক্ষণ ঠিক আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যদি প্রকাশ্যে নমাজ পড়ার বিষয়ে আপত্তি জানায়, তখন শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়টা তো পুলিশ প্রশাসনের ওপর এসে পড়ে।'

রোহিঙ্গা ইস্যুকে সামনে রেখে বিশ্বে সন্ত্রাস আমদানির ছক ইসলামি দুনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রোহিঙ্গা ইস্যুকে সামনে রেখে একজোট হওয়ার চেষ্টা করছে মুসলিম দুনিয়া। সম্প্রতি বাংলাদেশে দু'দিনের একটি বিশেষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল দ্য অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন। আরব দুনিয়া-সহ বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামিক দেশ এই রাজনৈতিক মঞ্চটির সদস্য। সম্মেলনের মূল অ্যাজেন্ডা ছিল মায়ানমার থেকে উৎখাত হওয়া রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। সম্মেলনের শেষে এই অর্গানাইজেশন বাংলাদেশের সঙ্গে যে যৌথ বিবৃতি পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে গত আগস্ট থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় সাত লক্ষ রোহিঙ্গা মুসলমান মায়ানমার থেকে 'অত্যাচারিত' হয়ে সেই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।

শুধু এতেই শেষ নয়, এই রোহিঙ্গা বিতাড়নকে সরাসরি 'এথনিক ক্লিনসিং' বা 'প্রাচীন অধিবাসী নির্মূলকরণ'-এর সঙ্গেও তুলনা করেছে দ্য অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন। উৎখাত হওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য সমস্ত ইসলামিক দেশের দরজা হাট করে খুলে দেওয়া উচিত বলে তাদের বক্তব্য। কূটনৈতিক মহল যদিও ইসলামিক অর্গানাইজেশনের এই বিবৃতিতে সিঁদুরে মেঘই দেখছে। তাঁদের বক্তব্য, এই সংগঠনের লক্ষ্য রোহিঙ্গাদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম আড়াল করে, তাদের শান্তিকামী হিসেবে প্রতিপন্ন করে বিশ্বের দরবারে রোহিঙ্গাদের জন্য সহানুভূতি আদায় করা। এর মাধ্যমে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলিকে একজোট করারও সুযোগ পাওয়া যাবে। এমনিতে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে ইসলামিক দুনিয়া মদত দিচ্ছে বলে যথেষ্ট চাপে রয়েছে এদের সংগঠন। এই চাপ কমিয়ে বিশ্বের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী-যুদ্ধে রোহিঙ্গাদের সুকৌশলে ব্যবহার করার পরিকল্পনা হয়েছে বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

গিনিস বুকে জে. নন্দকুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দীর্ঘ দিনের প্রচারক, পূর্বতন অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ, বর্তমানে প্রজ্ঞাপ্রবাহের রাষ্ট্রীয় সংযোজক জে. নন্দকুমার গিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান করে নিয়েছেন।

গিনিস বুক অব ওয়ার্ল্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের ২৭ থেকে ৩০ ডিসেম্বর কেরলে নন্দকুমারজীর তত্ত্বাবধানে বিজেশ মণি ২ দিন ৩ ঘণ্টা ২ মিনিটে একটি ফিল্ম তৈরি করেছেন, যা যে-কোনও চলচ্চিত্র নির্মাণের অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট থেকে স্কিন পর্যন্ত ন্যূনতম সময়।

মহেশতলা উপনির্বাচনেও বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসছে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ডামাডোলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা বিধানসভা উপনির্বাচন যেন অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক কস্তুরী দাসের মৃত্যুতে এই আসনটি খালি হয়েছে। এবার সিপিএম-কংগ্রেস যৌথ ভাবে প্রার্থী দিয়েছে। ফলে এবারের এই উপনির্বাচনে হবে ত্রিমুখী লড়াই। আর এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে গত কয়েকটি উপনির্বাচনের মতো এবারেও বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসবে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। তাদের বক্তব্যের সমর্থনে গত পাঁচটি নির্বাচনের ফলাফলকে তুলে ধরা হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল এরকম—

২০০৯-এর লোকসভা নির্বাচনে— ৬.১৪ শতাংশ।

২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে— ৪.০৬ শতাংশ।

২০১৩-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে— ৩.০০ শতাংশ।

২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে— ১৭.০২ শতাংশ।

২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনে— ১০.১৬ শতাংশ।

এই প্রসঙ্গে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮-তে হওয়া দুটি লোকসভা ও দুটি বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফলও দল অনুসারে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সেই বিশেষণেও বিজেপির বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। *(সারণী দ্রষ্টব্য)*

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ও সিপিএমের সমঝোতা হলেও বিজেপি তিনটি আসনে জয়ী হয়েছে। এবারে মহেশতলা বিধানসভা উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুলাল দাস, সিপিএমের প্রভাত চৌধুরীর নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষিত হলেও বিজেপি প্রার্থীর নাম এখনও জানা যায়নি।

সারণী

উলুবেড়িয়া লোকসভা উপনির্বাচন (২০১৮)			নোয়াপাড়া বিধানসভা উপনির্বাচন (২০১৮)		সবং বিধানসভা উপনির্বাচন (২০১৭)		কোচবিহার লোকসভা উপনির্বাচন (২০১৬)	
দল	প্রাপ্তভোট	শতাংশের হার	দল	শতাংশের হার	দল	শতাংশের হার	দল	শতাংশের হার
টিএমসি	৭৬২,২১৯	৬১	১০১,৭২৯	৫৪.৫৫	১০৬,১৮৫	৫১.২২	৭৯৪,৩৭৫	৫৯.০৩
সিপিএম	১৩৮,৭৯২	১১	৩৫,৪৯৭	১৯	৪১,৯৮৯	২০	—	—
বিজেপি	২৯৩,০১৮	২৩.২৯	৩৮,৭১১	২০.৭০	৩৭,৪৮৩	১৮	৩৮১,১৩৪	২৮.৩২
কংগ্রেস	২৩,১০৮	<১	১০,৫২৭	<১	১৮,০৬৩	৯	৩৩,৪৭০	২.৪৯

শ্রীচৈতন্য অনুধ্যান

কণিকা দত্ত

বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখেন কিন্নর রায়। একদা অতি বাম রাজনীতির আদর্শে দীক্ষিত কিন্নর লেখায় ও ভাবনায় নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন বিস্তর। বদলেছেনও। সমাজ ও রাজনীতি তাঁর পছন্দের বিষয় হলেও ইতিহাসকে আঁকড়ে থেকেছেন সর্বতোভাবে। সে কারণেই তাঁর কলম থেকে ধারবাহিকভাবে বেরিয়ে এসেছিল চৈতন্য জীবন কথার আদিপর্ব। কথা সাহিত্য পত্রিকায়। সেটিই এবার পুস্তকাকারে প্রকাশ করল দে'জ 'শ্রীচৈতন্যকথা' (আদিপর্ব) নাম দিয়ে।

ঠিক কোন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে শ্রীচৈতন্যর আবির্ভাব ঘটেছিল বর্তমান আখ্যানের সেটাই মূল উপজীব্য।

বইটির 'গৌরচন্দ্রিকা'য় কিন্নর লিখছেন, 'কাঁচা সোনা যেন, এমনই গায়ের রঙ। ঊর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত। মুণ্ডিত-মস্তক। অধোবাস- দোফেত্তা দিয়ে পরা কোনও সুতি বস্ত্র। তাও হাঁটুর সামান্য নীচে। নগ্নপদ। শ্রীচৈতন্য কি তাঁর এই পোশাক-সৃজনে সহজিয়া সাধকমণ্ডলী প্রায় অবলুপ্ত বৌদ্ধ অবশেষ— বজ্রযাত্রী-সহজযাত্রী সধর্ম অনুসারীদের ধর্মীয় রূপান্তর— আউল, বাউল, সাঁই, দরবেশ, মরমিয়া সাধককুলের পরিধেয় ভাবনার সঙ্গী হলেন? নাকি ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছা-কোঁচা-বিহীন সংক্ষিপ্ত বস্ত্রাবরণ তাঁকে অনুপ্রাণিত করল? কিংবা সনাতন ভারতীয় সন্ন্যাসী বা আজীবক সাধুদের বহির্বাস সংক্রান্ত সংস্কারকেই তিনি গ্রহণ করলেন পুনরায়?' (পৃষ্ঠা-৮)

মুসলমান বহির্শত্রুর আক্রমণ, আর ব্রাহ্মণ্য মৌলবাদের যাঁতাকলে পড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের। সুবে বাংলায় তখন মাৎস্যন্যায় দশা। দলে দলে মানুষ হয় ধর্মান্তরিত হচ্ছে, না হয় ভিটেমাটি ছেড়ে পালাচ্ছে। কিন্তু পালাবে কোথায়? সর্বত্রই তো এক পরিস্থিতি। যুগের এই ক্রান্তিলগ্নে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভারত তথা বাংলার ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি। যিনি পরবর্তীকালে পাল্টে দেবেন ইতিহাসের গতিপথ। শ্রীচৈতন্য

কি শুধুই ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব? তিনি সমাজ সংস্কারক, রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রদর্শকও। তাঁকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে সমাজ বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায়।

কালপরিবর্তনকারী এমন একটি মহাপুরুষকে নিয়ে কিছু লিখতে গেলে শুরু করতে হয় শুরুর শুরু থেকে। শচীমাতা ও জগন্নাথের অষ্টম গর্ভের সন্তান নিমাই। তার আগে অকাল মৃত সাত-সাতটি কন্যা সন্তান।

সেই নিমাইয়ের পূর্বপুরুষরা কোথা থেকে এলেন, কীভাবে এলেন, কোথায় এসে কোন পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেন সেই অকথিত, অজানা আখ্যানই বিধৃত হয়েছে 'শ্রীচৈতন্য কথার আদিপর্বে।

বইপাড়ার খবর

কিন্নরের পিতৃদেব অমরনাথ রায় ছিলেন রেল-চাকুরে। পুরীর জগন্নাথদেবের প্রতি তাঁর এক অদ্ভুত ভক্তিমিশ্রিত টান ছিল। (পৃষ্ঠা-১০) সেই বালকবেলা থেকে কিন্নরের পুরী ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে যাতায়াত। পরবর্তীকালে, কিন্নর লিখছেন, 'ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি অর্কক্ষেত্রের সূর্য মন্দির চত্বরে। নাটমন্দির, মূল মন্দির, জগমোহনের ছায়ায়। গজসিংহ, হাতি, রথচক্র, ঘোড়া সবই প্রস্তরময় তবুও যেন এই ছুটব, এই ছুটব— ছুটে যাব এমন ভাব নিয়ে অতি জীবন্ত।' (পৃষ্ঠা-১৬)

শ্রীক্ষেত্রে পড়ে থেকে জানার, বোঝার চেষ্টা করেছেন কিন্নর। পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণায় ধরতে চেয়েছেন 'শুরু'র প্রেক্ষাপটকে। ইতিহাসের ইতিবৃত্তকে। সেই ছোটাটা সবে শুরু করেছিলেন লেখক। তিনি জানেন না তাঁর চৈতন্য যাত্রা কোনদিকে। শুধু জানেন জীবন তো বয়ে চলে মৃত্যুর অভিমুখে। তাই লিখছেন, 'শ্রীচৈতন্যের অকাল মৃত্যু যতদূর মনে হয় তা হত্যাই, তাকে আবিষ্কার করতে পারি এক মৃতুমগ্ন বিরহী সত্তাকে। শ্রীকৃষ্ণ, জগন্নাথ, সমুদ্রসলিল— সবই তো তাঁর কাছে পরকীয়াসম, রাধাভাবের এই নিগূঢ় রহস্যলেখা।

আমার শ্রীচৈতন্যযাত্রাও কী সেই দিকে? জানি না।'

এক অনন্ত শ্রীচৈতন্য যাত্রার প্রস্তুতি পর্ব। শ্রীচৈতন্যকথা (আদিপর্ব)। লেখক : কিন্নর রায়। প্রকাশক : দেজ পাবলিশিং। মূল্য : ৫০০ টাকা।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

১৪ মে (সোমবার) থেকে ২০ মে (রবিবার) ২০১৮। সপ্তাহের প্রারম্ভে মেষে রবি এবং বুধ, বৃষে শুক্র, কর্কটে রাহু, তুলায় বক্রী বৃহস্পতি, ধনুতে বক্রী শনি, মকরে মঙ্গল এবং কেতু। মঙ্গলবার ভোর পাঁচটায় বৃষে রবি এবং সোমবার সন্ধ্যা ছ'টায় শুক্রের মিথুনে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মেষে অশ্বিনী থেকে কর্কটে পুষ্যা নক্ষত্রে।

মেষ : অপরিণামদর্শী। বাধার মধ্যে কর্ম সম্পন্ন। আত্মীয় পরিজন ও বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ। মিলিটারি এবং খেলোয়াড়দের শুভ। উদ্ভাবনী শক্তি ও গবেষণায় বাধা। লৌহ ও যানবাহন ব্যবসায় এবং বিদ্যার্থীর শুভ। ঝুলে থাকা বিষয়ের নিষ্পত্তি। কর্মে পদোন্নতি, অপ্রত্যাশিত ঝামেলা।

বৃষ : শিল্পী, সাহিত্যিক, কলাকুশলী, স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সার্বিক শুভ। প্রেমের পূর্ণতায় জেদ,গৃহ-সম্পত্তির ক্ষেত্রে শুভ। শরীরের যত্নের প্রয়োজন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বিদ্যা, বিলাসিতা ও ধনাগম। সাংসারিক বিষয়ে ব্যস্ততা। প্রমোটিং ও দালালি ব্যবসায় প্রসার। শারীরিক বিড়ম্বনা হলেও ভাগ্যাকাশে শুভ প্রভাবে ভাগ্যোদয়।

মিথুন : চিন্তা ও বুদ্ধির বাস্তবায়ন। কর্মে সন্তুষ্টি ও বন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। অর্থাগম হলেও সন্তানের কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা। বিদ্যার্থীর শুভ। স্ত্রীর নতুন কর্মযোগ অথবা পদোন্নতি। ধন-সম্পদ, বিদ্যা, বাহন, ভ্রমণ যোগ। উদ্যমের অভাব। অগ্রজের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। গুরুজন ও দেব-দ্বিজে ভক্তি।

কর্কট : সৃজনশীল ও জনহিতকারী কাজে উৎসাহ ও স্থানান্তর গমন। শত্রুজয়ী। খনিজ ও শেয়ার ব্যবসায় শুভ। নতুন নির্মাণ, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় কৃতিত্ব, নতুন বস্ত্র-অলংকার, ব্যঞ্জন-বিলাসিতায় তৃপ্তি ও আনন্দ। সম্পত্তি ক্রয়ে বিনিয়োগ। সন্তান ও শল্য-চিকিৎসকদের সৌভাগ্যের সূচনা।

সিংহ : লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহাবস্থান হেতু সোমবার সামগ্রিক ভাবে শুভ। গুরুজনের শরীরের যত্নের প্রয়োজন। শিল্পী-সাহিত্যিক, প্রেমিক-প্রেমিকাদের শুভ। শিক্ষানবিশ, বিশেষত ইলেকট্রনিক্স পরিসংখ্যান কাজের শংসা প্রাপ্তি। শত্রুতা, মানসিক অবসাদ, কর্মক্ষেত্রে খেসারত। সন্তানের সাফল্য গর্বের বিষয় হলেও হার্টের ট্রাবল দেখা দিতে পারে।

কন্যা : জ্ঞান, বুদ্ধি, দক্ষতার পূর্ণ মূল্যায়ন। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। বিলাসিতা, যানবাহন ক্রয়, শিক্ষার্থে স্থানান্তরে গমন। দৈব-দুর্ঘটনা ও আইনি ঝামেলা বিষয়ে সতর্ক থাকুন। যদিও মানবিক গুণের প্রকাশ থাকবে। বিরোধিতা এবং কটু মন্তব্য হতোদ্যমের কারণ, গতানুগতিক ধারা। মধুর বাক্যে অন্যের মন জয়।

তুলা : শারীরিক ক্লেশ তবে পুত্রলাভ জনিত আশা। দৈব-দুর্ঘটনা অস্ত্রোপচার। খাদ্যে বিষক্রিয়া। কথাবার্তায় সংযমী হওয়া দরকার। তরল পদার্থ ব্যবসায়ী এবং রিপ্রেজেন্টেটিভদের শুভ। ছলনাময়ীর দ্বারা পদোন্নতি ও সম্মান প্রাপ্তিতে বাধা। প্রতিবেশীর কারণে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান লাভের ভাল সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক : শারীরিক ক্লান্তি সত্ত্বেও রিসার্চ/উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ ও প্রয়োগ। পারিবারিক অসুস্থতা। বন্ধুসমাগমে সময় অতিবাহিত। সফটওয়ার, হিসাবশাস্ত্র বিষয়ে জ্ঞানের স্বীকৃতি। আর্থিক শুভ। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। শরীরের যত্ন নিন।

ধনু : কর্মের যোগসূত্রে ভ্রমণ। রুচিসম্মত পোশাক, খাদ্য, আড়ম্বর ও আনন্দ। বিদ্যা, পদোন্নতি, শুভানুষ্ঠান এবং সম্মান। শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। জ্ঞানবৃদ্ধি, মানবিকতার প্রকাশ। বস্ত্র, ঔষধ ব্যবসায় শুভ। বন্ধু সমাগমে তীর্থ ভ্রমণ। বিদ্যার্থী এবং প্রিন্টিং কর্মে নিযুক্তদের আশাতীত সাফল্য।

মকর : অস্থি, চর্ম ও চুলের সমস্যা হতে পারে। কর্তার আয়ের ক্ষেত্রে প্রশস্ত। বিশেষ কর্ম দক্ষতায় শংসা। লটারি, শেয়ারে শুভ যোগ। দৃঢ় মানসিকতা অর্থ ও ভাগ্যোন্নতির সহায়ক। কর্ম সংস্থানে অসতর্কতার কারণে ভাগ্য বিড়ম্বনা হলেও শেষ রক্ষা হবে। বয়স্কদের সার্বিক শুভ।

কুম্ভ : অন্ত্যজ শ্রেণীর জন্য উদ্বেগ ও সাহায্য। শারীরিক ক্লান্তি সত্ত্বেও মাতৃসুখ ও ভাগ্যোন্নতি যোগ। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কৃপা লাভ। আত্মীয়-পরিজনের কারণে মানসিক উদ্বেগ। মহিলা ভাগ্য বিড়ম্বনার কারণ। সামগ্রিকভাবে মিশ্রফল যোগ।

মীন : সামগ্রিক ভাবে কাজের ধারা অপরিবর্তনীয় থাকবে। প্রতিবেশী-স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। শত্রুজয়ী। বণিকের বিনিয়োগ ও ভ্রমণ। গৃহসুখ, সার্বিক বিচারে ইতিবাচক শুভ। ভাল সুযোগ হাতছাড়া, সম্পদ হানি। প্রতিযোগিতায় অনায়াস সাফল্য।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

শ্রী আচার্য্য